ফুলকর।

'কৃষিক্ষেত্র' ও 'সব্জীবাগ' প্রণেতা

এবং

মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরসিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের

উদ্যান সমূহের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক

Prabodha Chandra De

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, F. R. H. S. (Lond),

প্রণীত।

কলিকাতা।

৬৫।২ নং বিডন্‌ষ্ট্রীট, "ইলিসিয়ম প্রেস"

শ্রীহরিচরণ দাসদ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।

This humble work is respectfully dedicated

to

H. H. Prince Ulak Kudr Syed Nasir Ali Mirza

Bahadur of Murshedabad,

as a mark of profound respect and

sincere gratitude,

By the Author.

ভূমিকা।

কৃষি ও উদ্যান বিষয়ে বঙ্গবাসীর দিন দিন আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া ফলকর প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় এতৎ সম্বন্ধে যে কয়খানি পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই একটী বিষয়ের সুশৃঙ্খলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। যে পুস্তকে ধান্য, গোধূম প্রভৃতির চাষের কথা আছে, তাহাতেই আবার শাক, সব্জী, ফল-পাকুড় ও ফুলের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং কোন একটী বিষয়েরও পূর্ণতা হয় নাই এবং হওয়াও সম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নিয়মিতরূপে এক একটী বিষয় লইয়া সতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে ও করিবার ইচ্ছা রাখি।

এই সকল গুরুতর বিষয়ের অঙ্গ পূর্ণ করিয়া লেখা একজনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নহে। সেই জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই সকল পুস্তকের ভাবী সংস্করণের অঙ্গ অধিকতর পরিপুষ্টির জন্য গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ যদি স্ব স্ব অভিজ্ঞতা আমাকে লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমিত তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইবই, অধিকন্তু সাধারণেও বিশেষ উপকৃত হইবেন।

মুরসিদাবাদের আম্রের নাম সংগ্রহ এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আম্রের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিয়া মদীয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ রায়, বি, এল, মহাশয় আমাকে বিশেষ-রূপে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ দত্ত মহাশয় এই পুস্তকের প্রূফ সংশোধনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। এজন্য উভয়কেই আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

কলিকাতা
১লা মাঘ, সন ১৩০২ সাল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ফলকর।

প্রথম অধ্যায়।

ফলকরের জমী।

বিস্তৃত পরিমাণে ফলকরের আবাদ করিতে হইলে সতন্ত্র স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত এবং সেই স্থান জঙ্গলময় না হয়, অথবা সে জমী বর্ষাতে না ডুবিয়া যায় এজন্ত বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক জমী নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সাধারণতঃ ফলকরের জন্ত মাটি ঈষৎ এঁটেল অর্থাৎ দুধে-এঁটেল হওয়া আবশ্যক। এঁটেল ও দো-আঁশ মাটির মধ্যবর্ত্তী যে মাটি তাহাকে দুধে-এঁটেল কহে। দুধে-এঁটেল মাটিতে দো-আঁশ হইতে এঁটেল মাটির অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে।

ফলের গাছ বারমেসে ও স্থায়ী, সুতরাং যে জমীর মাটি গভীর অর্থাৎ যে জমীতে এইরূপ দুধে-এঁটেলের স্তর অন্ততঃ ৪ ৫ ফুট গভীর তাহাই প্রকৃষ্ট। জমীর অভ্যন্তরস্থিত স্তর যদি ৮.১০ ইঞ্চ বা এক ফুট অন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এবং প্রথম স্তরের

মাটির নিম্নেই যদি বালি বা কঙ্করের স্তর দেখা যায়, তবে তাহা পরিহার করা উচিত, কেন না এরূপ জমী বড় শীঘ্র নীরস হইয়া যায় এবং বৃক্ষাদির শিকড় যতই অধিক নিম্নে যাইতে থাকে ততই তাহার পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহের অভাব অনুভূত হয়। জমীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তরেই যদি দুঃখ-এঁটেল মাটি তিন চারি ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত এবং তন্নিম্নে বালি বা কঙ্কর পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ জমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথম স্তর এঁটেল হইলেও তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করতঃ কার্য্যক্ষম করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মাটি বেলে হইলে তাহাকে রূপান্তর করা ব্যয়-সাপেক্ষ। এঁটেল জমীর আবশ্যকীয় অংশ মাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে, কিন্তু বেলে-মাটিতে তাহা হয় না, কারণ আবশ্যকীয় পরিমাণ স্থান হইতেও মাটি অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত না হইলে গাছের অভাব মোচন হওয়া দুরূহ। এই জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া জমি নির্ব্বাচন করা উচিত।

ফলের জমীর মৃত্তিকায় সমধিক পরিমাণে হাড়-যান (Phosphoric acid) ও চুন (Lime) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যে জমীতে স্বভাবতঃ ইহার অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে উভয় প্রকারের সার প্রদান করা আবশ্যক। যে জমীতে উদ্ভিজ্জ-পদার্থের অস্তিত্ব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, তাহাতে গাছ সমধিক বৃদ্ধিশীল হয় বটে, কিন্তু ফলন অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। হাড়-যান ও চুনের পরিমাণ যে জমীতে অধিক থাকে, তাহাতে ফলন

অধিক হয়। মাটির সংগঠণ ও তাহার উৎকর্ষ সাধন বা স্বভাব পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যে যে উপায় অবলম্বনীয়, তাহা ইতি পূর্ব্বে মৎ-প্রণীত "কৃষিক্ষেত্র" নামক পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং সে সকল বিষয় ইহাতে পুনরুল্লেখের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম।

বাগানের উপযোগী ফলকর।

বাগানের আয়তন বুঝিয়া গাছের সংখ্যা ও প্রকারের ন্যূনাধিক্য করা উচিত। ব্যবসায়ীগণ যে ফলের উদ্দেশ করিয়া বাগান প্রস্তুত করেন, তাহাতে সেই বিশেষ ফলেরই আধিক্য দেখা যায়, কিন্তু সৌখীনগণের বাগানের পক্ষে সে নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে না। সৌখীনগণ স্ব স্ব বাগানের আয়তন ও স্বীয় পরিবারবর্গের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া নানাবিধ ফলের গাছ রোপণ করিবেন। বাগানমধ্যে বারমাসই কোন না কোন রকম ফল যাহাতে পাওয়া যায়, এরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক নানাবিধ গাছ রোপণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। যে গাছ সহজে জন্মে না অথবা জন্মিলেও সহজে ভাল হয় না, এরূপ গাছ রোপণ করায় লাভ নাই। তবে, সৌখীনগণ অনেক সময়ে দুর্লভ ফলের গাছও রোপণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য করেন। ব্যবসার্থ বা ব্যবহারের জন্য বাগান করিতে হইলে, কুতূহল পরিহার করিয়া, যে সকল গাছে ফল পাওয়া যাইবে তাহারই আবাদ করা উচিত।

সকল দেশে সকল প্রকার গাছ জন্মে না, এবং জন্মিলেও আশাপ্রদ ফলপ্রদান করে না। এই জন্য স্থানীয় জল-বায়ু ও মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া গাছ-নির্ব্বাচন করিতে হয়।

বৃক্ষের আকার ও বৃদ্ধি অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক গাছ রোঁপণ করিতে পারিলে বাগানের দৃশ্যও মনোহর হইয়া থাকে। বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে খালি-জমি ফেলিয়া মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গাছের সমষ্টি, কোথাও তিনটী, কোথাও দুইটী, কোথাও বা একটী গাছ থাকিলে বাগানের বাহার হয়। এক-দিকে যেমন উল্লিখিত প্রথা স্পৃহনীয়, অন্য দিকে তেমনি বৃক্ষের শ্রেণীতেও বাগানের শ্রী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাগানের গমনাগমনের প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ গাছ বসাইলে তাহার বড়ই বাহার হয়। এস্থলে বলা বাহুল্য যে রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততানুসারে গাছ বসাইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ রাস্তার ধারে বৃহজ্জাতীয় গাছ বসাইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিতান্ত ঘন হইয়া পড়িয়া স্থানীয় আলোক অবরোধ করে এবং রাস্তাটীরও শ্রী নষ্ট করে। রাস্তার ধারে বা বিস্তৃত ময়দানে গাছ বসাইবার যেমন একটা প্রণালী আছে, পুষ্করিণী, ঝিল ও প্রাচীর কিনারায় গাছ বসাইবার সেইরূপ একটা নিয়ম আছে। জলাশয়ের কিনারা হইতে ৮৷১০ হাত অন্তরে গাছ রোপণ বিধি। প্রাচীর বা বেড়ার পার্শ্বের জন্য ঘন ও মধ্যবিৎ জাতীয় গাছ রোপণ করা আবশ্যক। এই গাছ সকল ঘন ও শ্রীবৃদ্ধিশীল হইলে বাহির হইতে বাগানের ভিতরে লোকের নজর পড়িতে পারে না, অথচ বহির্দ্দেশ হইতে

সেই বৃক্ষশ্রেণীও দেখিতে মনোহর হয়। লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি গাছ এই বিষয়ের বিশেষ উপযোগী।

গাছের নাম।

বাগানে যে গাছই রোপণ করা যাউক, তাহার নাম জানা না থাকিলে নানাবিধ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গাছ চিনিয়া রাখিলেই যে কার্য্য শেষ হইল তাহা নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত গাছ সমূহকে চিনিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আম্রবৃক্ষ বলিলে নানা জাতীয় আম্রের গাছকে বুঝায়, ইহাতে ফজলীও বুঝাইতে পারে, আবার একটা জঘন্য গাছও বুঝাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক গাছটী সতন্ত্রভাবে বুঝিতে হইলে, যাহাতে সকল গাছের নাম সতন্ত্র থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

নামের বিষয়ে সঠিক থাকিতে হইলে, নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যে গাছ হইতে কলম করিবে অথবা যে গাছের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহার সঠিক নাম থাকা উচিত। গাছের নাম অনেক সময়ে গোলমাল হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি নাম অবগত আছেন, তিনি স্থানান্তরে গমন করিলে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে মরিয়া গেলে, নামও তাঁহার সহিত লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী লোকেরা যদি সেই নাম জ্ঞাত না থাকেন, তাহা হইলে হয় সে সকল গাছের আর নামোদ্ধারের চেষ্টা হয় না, কিম্বা

তাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছাক্রমে যে সে নাম দিয়া গাছ নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন। এইরূপে একই গাছ ভিন্ন লোকের বাগানে স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ গাছ ক্রয় করিতে হইলে বিশ্বস্ত চারাওয়ালাদিগের নিকট হইতে লওয়া উচিত, কেননা; নিম্নশ্রেণীর চারাওয়ালাগণ অর্থ-লোভে ক্রেতার আবশ্যক মত নাম দিয়া গাছ বিক্রয় করে। এই সকল চারা-ওয়ালাদিগের নিজস্ব কয়েকটী একজাতীয় গাছ থাকিলেই তাহারা ক্রেতার সমুদায় অভাব মোচন করিতে পারে অর্থাৎ ক্রেতার আবশ্যকীয় গাছ না থাকিলেও, তাহারা সেই অল্প সংখ্যক গাছের মধ্য হইতে সেই নাম দিয়া গাছ বিক্রয় করে। ইহা সচরাচর হইয়া থাকে। যাঁহারা সামান্য অর্থ-সাশ্রয়ের জন্য এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর নিকট হইতে গাছ খরিদ করিতে যান, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন, ইহা জানা কথা। এই সকল কারণে জানা গাছ হইতে চারা করিতে হইবে এবং বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে গাছ খরিদ করিতে হইবে। তাহাতে যদিও আপাততঃ খরচা সামান্য বেশী পড়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কিছুই নহে। পয়সা দিয়া ফজ্‌লী আম্রের গাছ ক্রয় করিলাম, কয়েক বৎসর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গাছটীকে বড় করিয়া তুলিলাম, কিন্তু ফল হইল হয়ত অতি নিকৃষ্ট। ইহাপেক্ষা আর অধিক মনোকষ্ট কিসে হয়! এইরূপে নিরাশ হওয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয় করিয়া যদি সঠিক জিনিষ হয় তাহা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

ইহা ব্যতীত সঠিক নাম সমেত গাছ ক্রয় করিলেও, অনেক সময়ে নাম ভুলিয়া যাইতে হয়, এইজন্ত আমাদের মতে উদ্যান তৈয়ার হইলে তাহার একখানি নক্সা করিয়া যে স্থানে যে গাছ বসান হইল, তাহার নির্দ্দেশ রাখিবার জন্ত সেই নক্সায় নম্বর এবং একখানি খাতায় সেই নম্বর ও গাছের নাম লিখিয়া রাখিলে গাছ মরিয়া গেলেও নামের বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না। কার্য্যের আরও সুবিধা করিতে হইলে প্রত্যেক গাছের কাণ্ডে নম্বর খোদিত করিয়া রাখা উচিত।

লতানিয়া বা সরু কাণ্ড-যুক্ত গাছে এইরূপে নম্বর খোদাই করিবার সুবিধা হয় না, সুতরাং সেরূপ গাছে টিকিট বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।

ফলকর বাগানের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি।

বাগান পত্তন করিবার সঙ্গে তাহার জন্ত আবশ্যকীয় সমুদায় যন্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ একবারে খরিদ করা উচিত নতুবা কার্য্যকালে তাহার অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

বাগানের উপযোগী যন্ত্রাদি কলিকাতায় বড় বড় লৌহাদির কারখানা যথা, টি টমসন কোম্পানী, জেসপ্ কোম্পানি প্রভৃতি এবং কোন কোন গাছ ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে গার্ডেন-নাইফ (Garden-knife), চোক-কলমের ছুরী (Budding-Knife), গাছ ছাঁটিবার কাঁচি, করাত,

লাঙ্গল, ফওড়া বা কোদাল, দাউলী বা নিড়নী, খুরপী, কাস্তে, কুড়াল, গাঁতি, ঝাঁঝরা বা জলের বোমা, কলম বাঁধিবার জন্য নারিকেল ছোবড়া, দড়ী, ঝুড়ি, ফল পাড়িবার জাল্‌তী বা ঠুসি ইত্যাদি সর্ব্বদা আবশ্যক হয়।

১। বৃক্ষ-লতাদির সরু শাখা প্রশাখাদি কাটিবার জন্য এক প্রকার ছুরী তৈয়ার হয়, ইহাকে গার্ডেন-নাইফ্ (Garden-knife) কহে। ইহার বাঁট ঈষৎ হেলান এবং ফলাও বিপরীত দিকে হেলান। বাগানে এই ছুরী সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা উচিত।

২। চোক-কলমের ছুরী। ইহার ফালের শেষভাগ ঈষৎ বক্র এবং বাঁটের শেষাংশ খুব পাত্‌লা। ইহাতেই সুশৃঙ্খলে চোক-কলম হইয়া থাকে।

৩। মোটা শাখা কাটিয়া ফেলিতে হইলে, করাতের আবশ্যক হয়। কুঠার বা দা'য়ে সরলভাবে ডাল কাটা যায় না, এজন্য করাত ব্যবহৃত হয়। বাগানের করাতের গঠন ও আকার স্বতন্ত্র।

৪। গাছ ছাঁটিবার কাঁচি (Prunning Scissor)। এই কাঁচি ছয় ইঞ্চ হইতে ২॥ বা ৩ ফুট লম্বা হয়। সরু ডালের জন্য ছোট এবং বড় ডালের জন্য বড় কাঁচি ব্যবহার হয়। এই কাঁচির ধরিবার স্থানে স্প্রিং দেওয়া থাকে, সুতরাং কোন বস্তু কাটিবামাত্রেই উহা পুনরায় আপনা হইতেই খুলিয়া যায়।

৫। লাঙ্গল (Plough)। লাঙ্গল আজকাল অনেক রকমের হইয়াছে। বাগানে ভাষা-চাষ (Shallow Ploughing) দিতে

হইলে দেশী লাঙ্গলেই কাজ চলিতে পারে কিন্তু, তদপেক্ষা গভীর চাষের জন্য শিবপুর-লাঙ্গল (Sibpur Plough) আবশ্যক।

৬। কোদাল। জমি কোপাইবার জন্য কোদাল আবশ্যক। দাঁড়া-কোদাল দ্বারা কাজ করিতে লোকজনের কষ্ট হয় না। সাবধানে গাছের গোড়া কোপাইবার জন্য ছোলা-কোদাল আবশ্যক। তদপেক্ষা সাবধানে কাজ করিবার জন্য সরু কোদাল রাখা উচিত। ঢালাই করা লোহের কোদাল মজবুদ হয় কিন্তু ইষ্টকে আঘাত লাগিলে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

চারা নির্ব্বাচন।

স্বচক্ষে দেখিয়া গাছ খরিদ করা উচিত। উদ্যান-স্বামী যদি দূরদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং সেস্থান হইতে চারাওয়ালার দোকান যদি দূরে হয়, তথাপি কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বয়ং সেই স্থানে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া গাছ মনোনীত করিয়া আনা উচিত। এ বিষয়ে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। যেরূপ পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে, তাহা কার্য্যতঃ সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না তাহা জানি, এবং ইহাও জানি, সম্রান্ত গাছ-ব্যবসায়ীগণ প্রতারণা করেন না, কিন্তু মনোনয়ন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন দোষ নাই। যাহা হউক, স্বয়ং পছন্দ করিয়া গাছ খরিদ করুন বা পত্র দ্বারা গাছ ব্যবসায়ীকে লিখিয়া পাঠান, গাছ পছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক এবং

সেইমত গাছ নির্ব্বাচন করিতে পারিলে অথবা সেইরূপ গাছের জন্য ব্যবসায়ীকে লিখিলে অনেক পরিমানে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

যে চারা উর্দ্ধে তাদৃশ লম্বা না হইয়া শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হয় ও সেই শাখা-প্রশাখা কোমল ও ঈষৎ নম্র হয় এবং উর্দ্ধ অপেক্ষা পার্শ্বদিকেই যে গাছের বৃদ্ধির গতি, ইদৃশ গাছই বিশেষ ফলবতী হয়। এইরূপ গাছের পার্শ্বদিকে শিকড় বিস্তৃত থাকা প্রযুক্ত নিরাপদে জমি হইতে উঠাইতে পারা যায়।

বড় অপেক্ষা ছোট চারা আমরা বিশেষ পছন্দ করিয়া থাকি। ইহার সপক্ষে কয়েকটী যুক্তি আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল। ১ম,—ছোট গাছের অপেক্ষাকৃত বড় শিকড় থাকে ;— ২য়-মূল্য কম ; ৩য়,-বিদেশ হইতে গাছ আনাইবার খরচা কম এবং সহজেই আনা যাইতে পারে ; ৪র্থ,—এরূপ গাছ রোপণ করিতে পরিশ্রম অল্প ; ৫ম,—প্রবল বায়ু বা ঝটিকায় গাছের গোড়া নড়িয়া যায় না, সুতরাং গাছের শিকড়ও ছিঁড়ে না ; ৬ষ্ঠ—উদ্যানস্বামী এইরূপ গাছকে অনায়াসেই নিজের মনোমত আকারে পরিণত করিতে পারেন ; ৭ম—পরিমিত যত্নে অল্প-দিন মধ্যে বড় গাছ অপেক্ষা সুশ্রী ও সবল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ছোটগাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, তাহার কারণ এই যে ইহাদিগের শিকড় অধিক থাকায়, স্বীয় পরিমিত অবয়বকে যথেষ্টরূপে পোষণ করিতে পারে এবং অবয়বে উপস্থিত অল্প কাষ্ঠ থাকায় শীঘ্র শীঘ্র নূতন শাখা-প্রশাখা নির্গত হয়। বড় চারার শাখা-

প্রশাখা নির্গত হইতে যে বিলম্ব হয়, তাহারও কারণ এই যে, উহার যে শিকড় থাকে, তাহা দ্বারা যে রস সংগৃহিত হয় তাহা উপস্থিত শাখা-প্রশাখাকে পোষণ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায় সুতরাং নূতন শাখা নির্গত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

আমদানীকৃত চারার পাট।

সকল স্থানেই আবশ্যকমত গাছ পাওয়া যায় না, এজন্য মফঃস্বলবাসীগণ সহরের গাছ ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে গাছ আনাইয়া থাকেন, কিন্তু আনিত নূতন গাছের বিশেষ পাট করিতে সকলে জানেন না; এজন্য অনেক গাছ মরিয়া যায়। ইহাতে সকল সময়ে গাছ ব্যবসায়ীদিগের দোষ দেখা যায় না। গাছ-ব্যবসায়ীগণ কাষ্ঠের অনাবৃত বাক্স মধ্যে গাছ সাজাইয়া, তাহার উপরে মশারির ন্যায় কাপড়ের ঢাকনি করিয়া দেন। কাপড় দ্বারা এইরূপে না ঢাকিয়া দিলে রৌদ্র ও বাতাসে গাছগুলি ঝিমাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কুলি, মজুর বা অপর লোকে গাছের ডাল পাতা নষ্ট করিতে পারে। একদিকে যেমন ইহাতে গাছ রক্ষা পায় অন্যদিকে ইহাতে গাছের গায়ে বাতাস লাগিতে পায় না এবং আবদ্ধ থাকা হেতু বাক্স মধ্যে উত্তাপ জন্মিয়া গাছের অনিষ্ট করে, কিন্তু ইহার কোন উপায় নাই! যাহা হউক গাছ আসিয়া পৌঁছিলেই কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে উহাকে লইয়া গিয়া কাপড়ের ঢাকনি খুলিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর গাছের গায়ে

যে সকল শুষ্ক বা গলিত পাতা থাকে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া শুষ্ক শাখা থাকিলে কাটিয়া দিতে হইবে। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া কোন অন্ধকার ও ঠাণ্ডা ঘরে কয়েক দিবস গাছ সমেত বাক্সগুলি রাখিয়া দিবে। ঝড় বৃষ্টি না থাকিলে রাত্রিতে শিশিরে রাখিয়া পুনরায় প্রাতঃকালে আটটার মধ্যে সেই গৃহমধ্যে তুলিবে। এই সময়ে গাছ নির্জীব থাকে, সুতরাং গোড়ায় অধিক জল দিবার আবশ্যক হয় না। তখন গোড়াতে যে রস থাকে তাহাই সেই নির্জীব গাছের পক্ষে যথেষ্ট, বরং এ অবস্থায় অধিক জল পাইলে গাছ মরিয়া যাইতে পারে। এক্ষণে কেবল গাছ-গুলিতে উত্তমরূপে জলের ছিটা দিতে পারিলে ভাল হয়। দুই-চারি দিন এইরূপ করিলে উহারা সুধরাইয়া উঠিবে।

জমীতে গাছ পুতিবার যদি এক্ষণে উপযুক্ত সময় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সেই গাছগুলিকে দুই তিন দিন ক্রমে ক্রমে আলোক ও রৌদ্র সহ্য করাইয়া, পরে জমীতে স্থায়ী-রূপে রোপণ করিতে হইবে। এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে অর্থাৎ কয়েক দিবস এইরূপে অন্ধকারে থাকিবার পরে যদি একবারে তাহাদিগকে জমীতে পুতিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সহসা বিপরীত পরিবর্ত্তন হেতু গাছগুলির বিশেষ অনিষ্ট হয়,—অনেক গাছ মরিয়াও যায়। আপাততঃ জমীতে রোপণ করিবার সময় উপস্থিত না হইয়া থাকিলে, গাছগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর৯ বা জথিরা দিয়া রাখিবে। যে দেশে বরফ পড়িয়া থাকে, তথায় গাছ আসিয়া পৌঁছিবার

পূর্ব্বে যদি বরফ পড়িয়া থাকে বা আসিয়া পৌছিবার পরে বরফ-পাতের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে গাছগুলিকে শাখা প্রশাখা ও পাঁতা-সমেত মাটির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিলে বরফে আর কোন ক্ষতি করিতে পারে না এবং পরে উহা উঠাইয়া লইলেই চলে। উষ্ণপ্রধান দেশেই আমাদিগের বাস, সুতরাং গরমের প্রতিবিধান করিবারই আমাদের আবশ্যক হয় এবং বরফ পতনে গাছকে কি করিতে হয় কি না হয়, কার্য্যতঃ আমরা তাহার আবশ্যকতা অনুভব করি নাই। তবে এ সম্বন্ধে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ ফলতত্ত্বজ্ঞ Mr. S. P. W. Humphreys যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা গেল :—

"If the trees have been received from the nursery rather earlier than you expected them, and you fear that they have been frosted on the way, place them all in a trench, roots, tops and all, and let them remain covered with soil until they are free from frost and it is time to plant them."*

জমীতে চারা রোপণের সময়।

প্রচণ্ড গরম, প্রখর শীত বা বরফ-পাত বা অতিরিক্ত বর্ষার সময়ে জমীতে গাছ রোপণ করা কোন মতে বিধেয় নহে। প্রচণ্ড

* The May Flower, April 1893.

রৌদ্রের দিনে জমীতে গাছ রোপণ করিলে, উহা যে মরিয়া যায় তাহার প্রধান কারণ এই যে, নূতন রোপিত চারা মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিতে পারে না, ফলতঃ উহার শরীরস্থিত রস রৌদ্রে টানিয়া লইয়া উহাকে বিনাশ করে। নূতন চারার শিকড় মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইলেও, রৌদ্রোত্তাপে যে পরিমাণে রস বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, সেই পরিমাণে রস শিকড় কর্ত্তৃক আহৃত হইতে পারে না।

অতিরিক্ত শীতে গাছের শিরা ও স্নায়ু সকল কুঞ্চিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সময়ে জমীতে গাছ বসিলে অধিকতর নির্জীব হইয়া পড়ে।

বর্ষার দিনে জমীতে গাছ পুতিবার আপত্তি এই যে, এই সময়ে গোড়ায় অধিক জল জমিয়া শিকড় পচিয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সে সময়ে মৃত্তিকা কর্দ্দমবৎ হইয়া থাকায় জমীতে উত্তাপ থাকে না,—মাটি আঁটিয়া যাওয়ার উহার মধ্যে বায়বীয় পদার্থ প্রবেশাধিকার পায় না—এবং সেই জমাট মাটির মধ্যে গাছের কোমল শিকড়ও প্রবেশ করিতে পারে না।

এই সকল বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, যে সময়ে মাটি শুষ্ক অথচ ঈষৎ রস বিশিষ্ট থাকিবে এবং রৌদ্র, বৃষ্টি বা শীতের প্রাথর্য্য থাকিবে না, এমন সময়েই জমীতে গাছ রোপণ করা পরামর্শসিদ্ধ। এই জন্যই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ হইতে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যে গাছ রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। এই সময়ে মাটি রসা অথচ ঝুরা

থাকে এবং বাতাসও রসযুক্ত থাকে। মাটি হাল্‌কা হইলে পূরা-বর্ষাতেও গাছ বসান যাইতে পারে।

গাছের ও জমীর স্বভাব বুঝিয়া বর্ষায় বা বর্ষার পূর্ব্বে বা পরে গাছ রোপণ করিতে হইবে। যে সকল গাছ বর্ষাকালের বৃষ্টিতে খারাপ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বর্ষার পরে, এবং যে সকল গাছ শীতে বাড়িতে পারে না, তাহাদিগকে বর্ষার প্রারম্ভে জমীতে পুতিয়া দিতে হইবে। যে সকল গাছ টবে জন্মিয়া আছে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত বর্ষা ভিন্ন যে কোন সময়েই জমীতে রোপণ করা যাইতে পারে।

গাছ রোপণের প্রণালী।

একই শ্রেণী বা চৌকায় বিভিন্ন জাতীয় ফলের গাছ রোপণ না করিয়া, প্রত্যেক ফলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাতে কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে গাছের যে সময়ে যে পাট করা আবশ্যক, তাহা সহজে হয়, নতুবা একটী গাছের পাট করিবার জন্য পরিশ্রম অধিক হয়। আম্রগাছের চৌকা মধ্যে পীচগাছ থাকিলে অথবা পীচ গাছের শ্রেণীমধ্যে কুলগাছ থাকিলে যদি সকল গাছকে একই ভাবে পাট করা যায়, তাহা হইলে কোন গাছের অনিষ্ট হয় এবং কোন গাছের ইষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছ একক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ অসুবিধা এই যে, এক সময়ে যে গাছের গোড়ায় হলচালনা

করা বা জলসেচন করা আবশ্যক, সে সময়ে হয়ত অন্য গাছের সে পাটের আবশ্যক নাই, সুতরাং শেষোক্ত গাছের অসাময়িক পাট হওয়ায় প্রকারান্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। এইজন্য যে চৌকায় আম্রের গাছ থাকিবে তাহাতে কেবল আম্রেরই গাছ,—যেস্থানে লিচুগাছ থাকিবে সেখানে কেবল উহাই থাকা উচিত। এক ক্ষেত্রে একরকম গাছ থাকায় যে কত সুবিধা, তাহা যাঁহারা হাতে-হেতেড়ে এই কার্য্য-করেন, তাঁহারাই বিশেষ বুঝিতে পারেন।

আবার একই শ্রেণীর গাছের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গাছ আছে এবং সে সকল গাছ হয়ত এক সময়ে না ফলিয়া অগ্র-পশ্চাৎ ফলিয়া থাকে। মিচরী-কন্দ আম্রের ন্যায় বৈশাখী-আম্রের সহিত ফজলী বা ভাদুড়ে প্রভৃতি আম্রের গাছ একস্থানে যদি রোপন করা যায়, তাহাতেও ঐরূপ বিপত্তি ঘটে। এই জন্য যে সকল আম্র বৈশাখমাসে ফলে, তাহাদিগকে সকলের পূর্ব্ব শ্রেণীতে বসাইয়া তাহার পশ্চাতে জ্যৈষ্ঠ মাসে যে আম্র পাকিয়া উঠে তাহা পুতিয়া দিতে হয়। যে গাছ যত বিলম্বে ফলে সে গাছকে তত পশ্চিমাংশে রোপন করিলে সুবিধা হয়। এইরূপে সকল গাছের বিষয়ই বিবেচনা করিতে হইবে।

গাছ রোপণ কালে জমার বিষয়ে কৃপণতা করা উচিত নহে। যে গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহার পূর্ণাবস্থায় কি পরিমাণ স্থান আবশ্যক হইবে তাহা অনুমান করিয়া, সেই পরিমাণ স্থান ব্যবধানে গাছ রোপণ করিতে হইবে। ইহাতে প্রকৃত আবশ্যক

পরিমাণ অপেক্ষাও যদি অধিক স্থান খরচ হইয়া যায় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে। গাছের চারিদিক যতই উন্মুক্ত থাকিবে, ততই উহার শাখা প্রশাখা স্বাধীন ভাবে বিস্তৃত হইতে পারিবে। কিন্তু আবশ্যকমত স্থান ব্যবধানে গাছ রোপণ না করিয়া যদি ঘন ভাবে রোপণ করা যায়, তাহা হইলে গাছ সুপুষ্ট, তেজাল ও বিস্তৃতাকার হইবার পরিবর্ত্তে লম্বা, শীর্ণ ও অল্প শাখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য ঘনরোপিত গাছে অল্প ফল হয়।

গাছ রোপণ করিবার পরে, গাছের বৃদ্ধি অনুসারে দুই বৎসর হইতে চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য জিনিষের আবাদ করা চলিতে পারে। ইহাতে গাছেরও উপকার হয় এবং জায়গারও সদ্ব্যবহার হয়। তাহা বলিয়া যে সে ফসলের আবাদ করিলে চলিবে না। ধান্য, গোধুম, রাই, সর্ষপ, মসিনা প্রভৃতি যে সকল ফসলের শস্য জমীতে পাকিয়া থাকে, এরূপ ফসলে মৃত্তিকা ক্ষীণতেজ হইয়া পড়ে। অতএব ফলকরের জমীতে ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া শাক-সব্জীর আবাদ করা উচিত। শাক-সব্জীর আবাদ করার জমী যে নিস্তেজ হয় না, তাহার কারণ এই যে, সব্জীর সময়ে মাটিতে সার দিতে হয়, জল দিতে হয় এবং নিড়ানী প্রভৃতি নানাবিধ পাট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সব্জীর ফসল জমী হইতে শীঘ্র উঠিয়া যায় এবং তাহাতে বীজ জন্মিতে পায় না। মাটি হইতে শিকড় কর্ত্তৃক সার পদার্থ সংগ্রহ হইতে অনেক সময় লাগে এবং সেই দীর্ঘ

সময় পাইবার পূর্ব্বেই সব্জী সকল আহারোপযোগী হইয়া উঠে সুতরাং মৃত্তিকাস্থিত সার পদার্থ সব্জীতে অধিক প্রবেশ করিতে পায় না। সব্জীর মধ্যে জলের অংশই অধিক থাকে। আর প্রথমোক্ত শস্যের আবাদে গাছ ও শস্যকে পুষ্ট করিতে অনেক সময়, লাগে এবং সার পদার্থের আবশ্যক হয়। এই সকল কারণে মেঠো-ফসল অপেক্ষা সব্জীর আবাদ করিলে ফলকরের ভূমি ভাল থাকে।

চারা জমী হইতে উঠাইয়া উহার গোড়ায় যে মাটি বাঁধিয়া দেওয়া যায় তাহাকে 'থোলে' কহে। গোড়ার মাটি খসিয়া যাইবার ভয়ে 'থোলে' করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। নিরক্ষর চারাওয়ালাগণ এত কঠিন ও এঁটেল মাটিতে গাছের থোলে করিয়া থাকে যে, তাহা সহজে ভাঙ্গিতে পারা যায় না। এইরূপ মাটি-বিশিষ্ট থোলে সমেত গাছ পুতিলে, জমিতে শিকড় প্রবেশ করিতে অনেক বিলম্ব হয় এবং তাহাতে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অনেকস্থলে মরিয়া যায়। গর্ত্তে গাছ বসাইবার পূর্ব্বে উহার থোলের উপরিভাগের মাটি ঈষৎ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

আবশ্যক অপেক্ষা অধিক গভীর করিয়া গর্ত্ত করিলে গাছের কাণ্ডাংশও কতক পরিমাণে জমীর ভিতরে থাকে, সুতরাং তাহা না করিয়া শিকড় ও মূল কাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থান অবধি মৃত্তিকামধ্যে রাখিয়া চারা পুতিতে হইবে। জোড় বা চোক কলমের গাছ পুতিবার জন্য এইটী বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জমী হইতে জোড় বা চোক অধিক উচ্চে না থাকে। চোক বা

জোড়ের স্থান অধিক উচ্চে থাকিলে প্রবল বাতাসে উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং সেই জোড় বা চোকের নিম্নস্থিত কাণ্ডাংশ হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া কলমটীকে বিনাশ করিতে পারে। নিম্নদেশে শাখাদি জন্মিলে কলমে রসাভাব হয়, সুতরাং তাহার অনিষ্ট হয়। মুরসিদাবাদের লোকে যে কলম বাঁধিয়া থাকে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কাণ্ডের অনেক উপরে জোড় থাকে। এরূপ গাছকে, অগত্যা জোড় উপরে রাখিয়াই মাটিতে পুতিতে হয়।

গর্ত্তমধ্যে গাছটী ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। বলা বাহুল্য, মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এবং তাহা হইতে তৃণাদির শিকড় বাছিয়া ফেলা আবশ্যক। উক্ত মাটির সহিত পাতা-সার বা অন্য কোন গলিত সার মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল। মাটি সারমিশ্রিত হইলে আলগা হয় এবং তাহাতে শিকড় অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে। শিকড়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে, এরূপ যত্ন সহকারে গর্ত্তমধ্যে গাছ বসাইয়া মাটি দ্বারা উহা পূর্ণ করিবে এবং ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা মাটি চাপিয়া দিবে। অতিরিক্ত চাপিয়া দিলে মাটি জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহার সূক্ষ্ম শীরা (Capillary tubes) সকলও থাকে না। তাহা ছাড়া মাটি চাপিবার সময় কোমল ও সূক্ষ্ম শিকড়ও ছিঁড়িয়া যায়, এবং চতুর্দ্দিক হইতে পেষিত হওয়ায় শিকড়গুলি সহজে মাটি ভেদ করিতে পারে না।

বর্ষাকালে জমীতে রোপণ করিলে গাছের গোড়ায় না জল

জমীতে পারে, এজন্য গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে কিন্তু অন্য সময়ে রোপণ করিলে গাছের গোড়ায় থলে করিয়া দিতে হয়। থলো করিয়া না দিলে মাটির উপরিভাগ ভিজিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু থলো করা থাকিলে, থালার মধ্যে ক্ষণকাল জল আটক থাকিয়া ক্রমশঃ মাটির ভিতরদিকে প্রবেশ করে।

হাপোরের চারা ও তাহার পাট।

যে সকল চারা হাপোরে বসান থাকে তাহাদিগের উপর বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। চারার আকার ও বৃদ্ধি অনুসারে হাপোর মধ্যে নিয়মিত পরিমাণ স্থান ব্যবধানে গাছ বসান গিয়া থাকে এই জন্য এক হাঁপোরে অধিক দিন একভাবে তাহা থাকিতে পারে না। অধিক দিন একস্থানে চারা হাপোর দেওয়া থাকিলে, উহার শিকড় বাড়িয়া যায়, এবং তাহাকে তুলিবার সময়ে অনেক শিকড় কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, শাখাপ্রশাখা বাড়িয়া গিয়া হাপোর ঘন ও আলোকহীন হইয়া পড়ে ও তন্নিবন্ধন গাছ গুলি রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত একস্থানে এক বৎসরের অধিক উহাদিগকে থাকিতে না দিয়া, বর্ষার প্রারম্ভে সতন্ত্র হাপোরে চারা গাছগুলিকে অপেক্ষাকৃত অধিকস্থান ব্যবধানে পুতিয়া দিতে হইবে। গাছ মাটি হইতে তুলিবার সময়ে যেন উহার গোড়া হইতে মাটি না

ঝরিয়া যায়। মাটি ঝরিয়া গিয়া শিকড় বাহির হইয়া পড়িলে গাছ ঝিমাইয়া পড়ে এবং জমীতে পুনঃসংলগ্ন হইতে বিলম্ব হয়। হাপোরের মাটি নীরস হইয়া থাকিলে গাছ তুলিবার সময়ে মাটি খসিয়া যায়, সুতরাং এ অবস্থায় গাছ তুলিতে হইলে ২।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে হাপোরে উত্তমরূপে জল সেচন করিয়া রাখিতে হইবে। সেই জল টানিয়া গেলে তবে গাছ উঠাইতে হইবে। ইহাতে আর সহজে মাটি ঝরিয়া যাইতে পারে না।

যতবার এক হাপোর হইতে অন্য হাপোরে গাছ স্থানান্তর করিতে হইবে ততবার তাহার উপরিভাগের সূক্ষ্ম শিকড় ছাঁটিয়া দিলে গাছ লম্বা হইতে পারে না। হাপোরে অবস্থান কালীন কলমের গাছের নিম্নভাগস্থিত বীজ-চারার অংশ হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, অন্যথা উহা বাড়িয়া গিয়া উপরিস্থিত কলমটীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

হাপোর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। তৃণ জঙ্গলাদি জন্মিলে তাহা মুক্ত করিয়া সময়ে সময়ে মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে হাপোরে সার ছড়াইয়া দিলে গাছগুলি সবল ও সুশ্রী হইয়া থাকে। হাপোরে জল দেওয়া আবশ্যক একথা বলা বাহুল্য।

গাছকে ফলবতী করিবার উপায়।

নানা কারণে গাছে ফল আইসে না। গাছ রুগ্ন বা পীড়িত হইলে অথবা অতিরিক্ত তেজাল হইলে গাছে ফল হয় না একথা নূতন নহে। রুগ্ন গাছের রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করা নিতান্ত প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় জল জমিলে বা মাটি খারাপ হইয়া গেলে, গাছের শিকড়ে বা অবয়বে নানা কীটের আবাস হয়। আকার দেখিয়া যদি বোধ হয় যে গাছটী-রুগ্ন হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথমতঃ উহার অবয়ব পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কোন কীট বা তাহার বাসা বা ডিম্ব দেখিতে পাইলে তাহা অবিলম্বে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কীটে গাছের কাণ্ড ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বাসা করে। পাঁজ্রেও কীট বাস করে। এইরূপ কীটাক্রান্ত স্থান কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। পীচ, আম্র, লিচু প্রভৃতি গাছ হইতে সময়ে সময়ে আটা নির্গত হয়। বৃক্ষ অবয়বে কীট প্রবেশ না করিলে আটা বাহির হয় না। যে গাছে এইরূপ আটা বাহির হইতে দেখা যাইবে, তাহার সেই অংশ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা কেবল কাটিয়া দিলে চলিবে না,—যতদূর সেই গর্ত্ত বা কীট প্রবেশের দাগ দেখা যাইবে ততদূর কাটিয়া দিয়া ঐ ক্ষতস্থানে আল্‌কাতারার প্রলেপ দিতে হইবে। আল্‌কাতারার পরিবর্ত্তে চারিভাগ রজনের সহিত একভাগ মসিনার তৈল অগ্নির উত্তাপে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আর তথায় কীটের ভয় থাকে না। যে কীট-গ্রস্থ গাছে এইরূপ ছুরি চালান অসম্ভব, তাহাকে সূক্ষ্ম

মুখ-বিশিষ্ট পিচ্‌কারী সাহায্যে তীব্র সাবান ও তামাকের জল দিয়া ধৌত করিয়া, পরে ঐরূপ প্রলেপ দিতে হইবে। এইরূপ পিচকারি দিলে যদি ক্ষতস্থান হইতে কীট না বাহির হয় তাহা হইলে কোন ফলই হইল না। গাছের মধ্যে কীট রাখিয়া প্রলেপ দিলে, ঐ কীট অন্যদিক দিয়া বাহির হইবে এবং বৃক্ষের মধ্যে অধিকতর ক্ষত করিবে।

গাছের শিকড়ের অংশেও যদি পোকা হয়, তবে তাহারও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং গাছের গোড়ার মাটি তুলিয়া কয়েক দিবস তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া যথা নিয়মে নূতন মাটি দ্বারা গোড়া পুনরায় ঢাকিয়া দিতে হইবে।

পাতার পোকা লাগিলে পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া একবারে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নানাবিধ কীটের আক্রমণ হইতে গাছকে রক্ষা করিতে হইলে বাগানে আদৌ জঙ্গল হইতে দিবে না,—গাছের গোড়ায় জল বসিতে দিবে না,—মধ্যে মধ্যে মাটি কোপাইয়া আল্‌গা করিয়া দিবে এবং মাটী খারাপ হইয়া গেলে উহার কতকাংশ একবারে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, নূতন মাটি দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া দিবে। ইহা ব্যতীত গাছকে নীরোগী করিবার আমরা কোন উপায় দেখি না। রোগ প্রশমিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা রোগোৎপত্তির কারণ নিবারণ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য।

অনেক গাছ মুকুলিত হয় কিন্তু ফল ধারণ করে না। এইরূপ গাছে মুকুল ধরিলে গোড়ায় উত্তমরূপে সার প্রদান ও জল

সেচন করা আবশ্যক। এই সময়ে সহসা গাছে তেজ আনিতে পারিলে ফল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। *বিনা উপাদানে যেমন কোন সামগ্রী নিয়মিতরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ কোন সার ব্যতিরেকে গাছে যথেষ্ট বা ভাল ফল হইতে পারে না। জল ও বাতাসে গাছ জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু তাহাকে ফলবতী করিতে হইলে যথোপযুক্ত সার দেওয়া উচিত। সার সংযোগে গাছ পুষ্ট হয় ও ফল ধারণ করে। ফলকর গাছের জন্য ক্ষার, মাছের কাঁটা ও অস্থিসার বিশেষ ফলপ্রদ।

শতকরা ৮ ভাগ যবক্ষারজান এবং ১২ ভাগ ফস্ফরিক এসিড বিশিষ্ট সার গাছে প্রদান করিলে তাহার ফল সুমিষ্ট ও সুগন্ধ যুক্ত হয়। আবার শতকরা তিনভাগ যবক্ষারজান ৯ ভাগ ফস্ফরিক এসিড এবং ১১ ভাগ ক্ষারবিশিষ্ট সারে অধিকতর মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত ফল হয়। মেঃ লুকাস (Mr. F. Lucas) নামক একজন বিচক্ষণ ফলতত্ত্বজ্ঞ সাহেব বলেন যে, যে সারে ১৬ ভাগ সুপার-ফস্ফেট আছে তাহা ফলের গাছে দিলে ফল অতি মিষ্ট ও আঘ্রান বিশিষ্ট হয়।* গৈইল, বা জীব-জন্তুর মলমূত্রের সহিত ৪৮ ভাগ মাজি-মাটি ও ৪৮ ভাগ ফসফেট থাকিলে ফলের মধ্যস্থিত অপ্রিয় আঘ্রাণ দূর হইয়া ফল মিষ্ট হয় ও তাহার সৌরভ মধুর ও প্রিয় হইয়া থাকে।

সার দিলে গাছ ফলবতী হয় কিন্তু অপরিমিত সার দিলে আবার তাহা দাঁড়াইয়া যায়। গাছ অতিশয় তেজাল ও ফলহীন

* Gardeners Chronicle.

হইলে তাহাকে সাঁড়া বা রাঁড়া গাছ কহে। ফলকরের গাছ রোপণ করিবার উদ্দেশ্য [illegible] উৎপাদন করা, সুতরাং তাহাতে অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা [illegible] লাভ না হইয়া ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত পরিমাণ স্থান ব্যবধানে গাছ পুতিলে উহার শাখা প্রশাখা বৃহদাকার হয়, সুতরাং শিকড় কর্ত্তৃক যে পরিমাণে রস সংগৃহিত হইতে পারে, তাহাতে বৃক্ষাবয়বের পোষণ হইয়া ফলধারণ বা সেই ফলের পোষণ হওয়া অসম্ভব, এই জন্য দেখা যায় যে অল্প শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ছোট গাছে যত ফল হয়, প্রাচীন বা বৃহদাকার গাছে তদ্রূপ হয় না। ভাল ফল জন্মাইতে হইলে শাখা প্রশাখার সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে হয়।

গাছ হইতে শীঘ্র ও অধিক ফল লাভের জন্য অন্যায় চেষ্টা করা উচিত নহে। গাছের যেমন বয়স ও শক্তি সেই পরিমাণে ফল হইতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অল্পবয়স্ক গাছে তাহার শক্তির অতীত-সংখ্যক ফল উপর্য্যুপরি জন্মিলে, কয়েক বৎসর মধ্যেই উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কৃষকের উচিত, স্বভাবের অনুসরণ করা, স্বভাবকে সাহায্য করা। বলপূর্ব্বক ফল উৎপাদনের চেষ্টাকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায় কহে। এরূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য নহে। যে পরিমাণে সার দিলে,-জল সেচন করিলে অথবা অপরাপর পাট করিলে স্বভাবের সহায়তা হয় এবং গাছের ও উপকার হয় এইরূপ প্রণালীতেই উদ্যানের সকল কার্য্য সমাধা করা উচিত। শাক-সব্জী বা ধান্য, গম প্রভৃতি মেটো ফসলের

পক্ষে প্রচুর সার দেওয়ার লাভ আছে, কেননা, একবার ফসল প্রদান করিলেই উহাদিগের কার্য [illegible] হইল, কিন্তু ফলের গাছের যখন তাহা নিয়ম নহে, [illegible] ফলভোগ করা উচিত। আশু লাভের লোভে ভবিষ্য[illegible]াদ ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলমের উদ্দেশ্য।

বৃক্ষ বা গুল্মলতাদির কলম করণের প্রথা এদেশে যে নূতন তাহা নহে, তবে ইতিপূর্ব্বে কৃষি বা উদ্যানকার্য্যের কোন একটা নিয়মিত পদ্ধতি না থাকায়, এই বিস্তৃত বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনী হইতে কুটিরবাসী কৃষি বা শ্রমজীবীগণেরও গাছ-পালার দিকে একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। বড় অধিক দিনের কথা নহে,—বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীতেও কেবল মানিকতলা ভিন্ন অন্যত্র কোথাও গাছপালা বিক্রয়ের আড্ডা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাওয়ালা হইতে বৃহৎ বৃহৎ নর্সরী সকল দ্বারাও প্রতি-বৎসর সাধারণের গাছের অভাব পূরণ হইয়া উঠিতেছে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশ মধ্যে বাগ-বাগিচার সখ উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই সঙ্গে গাছের কলম করিবার চেষ্টা ও ইচ্ছা সকলের বাড়িতেছে। একদিকে যেমন কলম করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনি কলম করি-বার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা জানিয়া রাখিলে, কার্য্যকালে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। চিরপ্রচলিত প্রথামত চক্ষু মুদিত করিয়া কলম করিলে, কতক পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে

সত্য, কিন্তু তদ্বিষয়ক শিল্প ও বিজ্ঞানের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

অনেকে অনেক রকম উদ্দেশ্যে কলম করিয়া থাকেন। কেহ গাছের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, কেহ বা গাছের আকারকে সুঠাম করিবার জন্য, আবার কেহ বা অল্পদিন মধ্যে গাছকে ফলবতী করিবার জন্য কলম করিয়া থাকেন। যিনি যে উদ্দেশ্যেই কলম করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কলম করিবার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

বীজ হইতে যে চারা জন্মে তাহাই স্বাভাবিক, আর অন্য কৃত্রিম উপায়ে যে চারা উৎপন্ন করা যায় তাহাকে কলম কহে। বীজের-চারা সকল সময়ে বা সকল স্থানে স্বধর্ম্ম বা স্বভাব রক্ষা করিতে না পারিয়া প্রকারান্তর প্রাপ্ত হয়। এই স্বভাবটী প্রায় বীজ মাত্রেরই দেখা যায়। উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের বীজ হইতে অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীরও গাছ হইয়া থাকে। আবার ঘটনাক্রমে কোন অপকৃষ্ট আম্রের বীজ হইতেও ভাল জাতীয় আম্র জন্মিতে পারে। এই জন্য বীজের-চারার প্রতি নির্ভর করা যায় না।

বীজের স্বভাব যে নিতান্ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহার কয়েকটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, গাছ যখন মুকুলিত হয়, তখন পুষ্প সকল গর্ভবতী হয়, কিন্তু স্বজাতীয় পুংপুষ্পের রেণু দ্বারাই যে গর্ভসঞ্চার হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ মক্ষিকা ও বাতাস সাহায্যে এক গাছের রেণু অপর গাছের স্ত্রী

পুষ্পে সঞ্চারিত হইতে পারে এবং এইরূপে সঞ্চারিত গর্ভ হইতে যে বীজ জন্মে তাহাকে শঙ্কর-বীজ কহা যায়। শঙ্কর-বীজ পিতৃ-মাতৃকুলের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ধারণ করতঃ তদনুরূপ ফল প্রদান করে। এই উভয় কুলের শক্তির ন্যূনাধিক্য মত বীজের গুণেরও ন্যূনাধিক্য হয় অর্থাৎ কখন বা সেই বীজে পৈতৃক, কখনও বা মাতৃকুলের গুণ অধিকতর প্রবল থাকে। উৎকৃষ্ট আম্রের সহিত নিকৃষ্ট আম্রের সংযোগ হইলে খাঁটি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট আম্র না হইয়া উভয়ের মধ্যেবর্ত্তী কোন একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। এইরূপে সকল গাছেরই প্রকার দিন দিন বাড়িতেছে, সুতরাং বীজের গাছকে অবহেলা করা উচিত নহে, বরং তাহাকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা ও পালন করিয়া রাখিতে পারিলে নূতন একটী রকম লাভ হইতে পারে। সেই গাছে ফল জন্মিলে যদি তাহা মনো-মত না হয়, তখন তাহাকে কাটিয়া ফেলিলে ক্ষতি নাই। উল্লি-খিত প্রণালীকে ইংরাজিতে হাইব্রিড (Hybrid) ও ক্রশ-ব্রিডিং (Cross breeding) কহে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যে ও উহাকে ইচ্ছাধীন করিয়াছে। অনেক ফল ফুল এইরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত স্বাভাবিক জলবায়ু ও মৃত্তিকাভেদেও বীজোৎপন্ন গাছের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। দেশ কাল ও সঙ্গ বিপর্য্যয়ে যেমন জীবের শারিরীক ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, উদ্ভিজ্জগতের পক্ষেও অবিকল তাহাই। মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু মেঃ টি, এন, মুখার্জ্জির নিকট শুনিয়াছি যে, এডেন বন্দরে ও

তৎসন্নিকটস্থানে যে বকফুলের গাছ জন্মে, তাহা ৫।৬ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না এবং তাহাও সুপুষ্ট হয় না; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে সেই বকফুলের গাছ ২০।৩০ হাত উচ্চ হইয়া শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। ভারতীয় গাছপালা বিলাতে শাসি-নির্ম্মিত গৃহমধ্যে জন্মে, কারণ তথাকার আব-হাওয়া এত ঠাণ্ডা যে, ভারতের ন্যায় উষ্ণ দেশের গাছ তথায় সহজে জন্মিতে পারে না। অধিক দূরের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা আসাম, দারজিলিং,-সিমলা প্রভৃতি ঠাণ্ডা দেশের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলেও এই পরিবর্ত্তন বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিব। আসাম, দারজিলিং প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে চা'র আবাদ হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা জন্মে না কেন? ঐ সকল স্থানে কমলালেবু যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু বহু যত্নেও বাঙ্গালায় তদনুরূপ ফলন বা ফলের আস্বাদন হয় না কেন? ইহার একমাত্র কারণ, আব-হাওয়া ও মৃত্তিকাভেদ।

এই পরিবর্ত্তন সংশোধনের উপায় সম্পূর্ণ না হইলেও, কতক পরিমাণে রোধ করিবার পক্ষে কলমই একমাত্র উপায়,—কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি, সকল রকম কলমই এই পরিবর্ত্তন-রোধ-কারী নহে। জোড়-কলম এবং চোক-কলম এতৎপক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বীজোৎপন্ন চারা গাছের যেমন স্বভাব পরিবর্ত্তনের দিকে অতি দ্রুত গতি, কলমের গাছের কিন্তু সেরূপ নহে। কলমের গাছের স্বভাব প্রায় মূলগাছের ন্যায় থাকে, এইজন্য মূল ও আদর্শ

গাছের (Mother-plant) সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কলম দ্বারা চারা তৈয়ার করাই সুবিধা। এক দেশের বীজোৎপন্ন চারা স্থানান্তরে গিয়া প্রকারান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু কলমের গাছে তাহা হইতে পায় না।

কলমকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—১ম, কেবলমাত্র গাছের কোন অংশ হইতেই চারা জন্মান; ২য়, এক গাছের চারার সহিত অপর গাছের কোন অংশের সম্মিলন।

কলম-সম্ভাবী গাছ।

বৃক্ষ, লতা, বা গুল্ম নির্ব্বিশেষে কলম দ্বারা গাছ জন্মে না। উদ্ভিদ্শাস্ত্রে উদ্ভিদের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে যে দুইটী বৃহৎ আছে, তাহার একটীর কলম হইতে চারা জন্মে, এবং অপরটীর বীজ বা মূল ভিন্ন অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে চারা হয় না। এই দুইটী শ্রেণীর মধ্যে একটীর নাম Exogenus এবং অপরটীর নাম Endogenus এই দুই জাতীয় গাছের স্বাভাবিক গঠনের বিভিন্নতা হেতু গাছ দেখিবামাত্রেই তাহা কোন জাতীয়, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

এক্সোজিনস্ (Exogenus) শ্রেণীর গাছসকলের পত্র সমুদায়ের শিরা অসরল এবং জাল-বৎ (reticulated) পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত; গাছের পাতা শুষ্ক হইলে বা পাকিয়া গেলে একবারে গাছ হইতে খসিয়া যায়; কাণ্ড মধ্যস্থিত শিরা সকলও পত্র-মধ্যস্থিত শিরা সমূহের ন্যায় জালবৎ সংশ্লিষ্ট। আর

জাম, কাঁটাল, লিচু, প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি লতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় গাছের কলম হইয়া থাকে।

এণ্ডোজিনস্ শ্রেণীর বৃক্ষাদির পত্র ও কাণ্ডস্থ শিরা সমুদয় পরস্পর সমবাহু (Parallel) রূপে অবস্থান করে। পত্রের শেষাগ্রভাগ সূচাগ্রবৎ। গাছ হইতে পাতা সহজে খসিয়া না পড়িয়া অনেকদিন কাণ্ডে লাগিয়া থাকে এবং অবশেষে খসিয়া গেলে কাণ্ডে একটা দাগ থাকিয়া যায়। নারিকেল, সুপারি বা তালগাছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। এই জাতীয় কাণ্ড-যুক্ত গাছে প্রায় গাঁট থাকে না। নারিকেল, সুপারি, তাল, কলা, খর্জ্জুর, আর্দ্রক, হরিদ্রা, দশবাইচণ্ডী, প্রভৃতি এই শ্রেণীর গাছ। ইহাদের কলম হয় না। এই জাতীয় মূলবিশিষ্ট গাছের মূল সতন্ত্র করিয়া রোপণ করিলে গাছ জন্মে, কিন্তু তাহাকে কলম বলা যায় না। ইহাকে বিভাগ করা গাছ কহে। এই প্রণালীকে ইংরাজিতে Division বলা যায়।

উপরোক্ত দুইটী শ্রেণীর গাছ দেখিয়া যাহাতে সহজে চিনিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা আবশ্যক, নতুবা যে সে গাছে কলম করিয়া অনর্থক পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করা কোনমতে বিধেয় নহে। এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিশেষ কোন উপায়াবলম্বনের আবশ্যকতা দেখা যায় না। উল্লিখিত কয়েকটী লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলেই অভিজ্ঞতা সহজেই জন্মিতে পারে।

কলমের প্রকার।

আজকাল অনেক রকমের কলম প্রণালী সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার অধিকাংশই প্রাচীন কয়েকটীর অল্পাধিক সংস্করণ বা প্রকারান্তর মাত্র। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, কলম করিবার প্রধানতঃ দুইটী রকম আছে ;—১ম রকম, গাছের অংশ মাত্র লইয়া, এবং ২য়টী একটী চারার সহিত অপর গাছের অংশের সংযোজনা দ্বারা। প্রথম প্রকারের অন্তর্গত,—কাটিং বা খোঁচা-কলম (Cutting), 'গুল' বা 'গুটী'-কলম এবং দাবা-কলম (Layering)। দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্গত—চোক, (Budding) জিব্ বা জিহ্বা (Tongue Grafting), জোড়-কলম (Inarching) ইত্যাদি।

উল্লিখিত কয়েকটী রকম ব্যতীত অনেক গাছের পাতা হইতেও চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল গাছ গুল্ম জাতীয় এবং অতিশয় স্থূল-পত্র-বিশিষ্ট ও কোমলস্বভাব। ইকিভেরিয়া (Echeveria), বিগোনিয়া (Begonia), জেস্‌নিরা (Gesnera), হিমসাগর (Bryophyllum) প্রভৃতি এই শ্রেণীর গাছ। ফলকরের মধ্যে এ শ্রেণীর গাছ না থাকায় পাতা হইতে কলম করিবার কথা এ পুস্তকে উল্লিখিত হইবে না।

কাটি-কলম, গুল-কলম, চোক-কলম প্রভৃতি করিতে হইলে শাখা বা কাণ্ডটী বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাফল্য লাভের ইহা একটী গুহ্য উপায়। অতিরিক্ত স্থূল, পুরাতন ও রুগ্ন শাখায় শীঘ্র অথবা ভাল কলম হয় না। অর্দ্ধ-

পরিপক্ক কোমল-কাণ্ড যেমন বৃদ্ধিশীল ও রসাল থাকে, স্থূল, রুগ্ন বা পুরাতন শাখায় তদ্রূপ থাকে না, এজন্য শেষোক্ত প্রকার শাখা পরিহার করিয়া অর্দ্ধ-পরিপক্ক ও তেজাল শাখাতে কলম করিতে হয়। আবার অতিরিক্ত কোমল ও নূতন শাখাতেও কলম করিবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত আছে, কারণ এরূপ শাখার রস এত তরল যে, উহাতে অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র রস নির্গত হইয়া গিয়া শাখাটীকে ঝিমাইয়া দেয় এবং অবশেষে সূর্য্যোত্তাপ ও আলোকের সংস্পর্শে ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। এই কারণে অর্দ্ধ পরিপক্ক শাখাই কলমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অর্দ্ধ-পরিপক্ক শাখা বা কাণ্ডের রস অতিশয় ঘন বা তরল নহে, অথচ সূর্য্যোত্তাপ ও আলোক অনেক পরিমাণে সহ্য করিতে পারে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে অনেক রকম কলম বাঁধিয়া থাকেন এবং ইহাও দেখিতে পাই, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের শ্রম ব্যর্থ হইয়া থাকে, ইহাতে কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই, কারণ আনুসঙ্গিক সকল বিষয়ে দৃষ্টিহীন হইয়া কার্য্য করিলে এরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উদ্যান বা কৃষিকার্য্যের যত সামান্য বিষয়ে পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারা যায়, সুফল-লাভের আশা তত অধিক ও নিশ্চিৎ। সাধিলেই সিদ্ধি আছে, ইহা মহাজনের কথা। মহাজনের কথা বৃথা হয় না। সাধকের সাধনার উপরে ফলাফল নির্ভর করে।

কাটি-কলম।

(CUTTING.)

গাছ হইতে শাখাকে ছোট ছোট কাটির আকারে কাটিয়া যে কলম হয়, তাহাকে কাটি-কলম কহে। কোমল ও রসাল কাণ্ড বা শাখা বিশিষ্ট গাছের কাটিকলম হইয়া থাকে। কঠিন কাণ্ড, ও ঘন রস বা আটা-বিশিষ্ট গাছের কাটি-কলম শীঘ্র জন্মে না, এজন্য উপায়ান্তর হইয়া অপরাপর প্রণালীর আশ্রয় লইয়া কলম করিতে হয়।

কলমোপযোগী শাখার বয়সের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কলম করিবার পূর্ব্বে উহাকে বসাইবার জন্য কোন ছায়া বিশিষ্ট ঠাণ্ডা জায়গায় ছাপোর বা জখিরা করিয়া রাখিতে হইবে। তদনন্তর উপযুক্ত শাখা কাটিয়া আনিয়া, প্রত্যেক শাখাকে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চ লম্বা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। এইরূপে খণ্ড খণ্ড করিবার কালে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক খণ্ডের উভয় শেষ-পার্শ্বে যেন একটি চোক বা গাঁট থাকে, এবং ইহাও দেখিতে হইবে যে, সেই উভয় শেষাংশ ঈষৎ হেলাইয়া কাটা হইয়াছে।

কলমগুলিকে এক্ষণে পুতিয়া দিতে হইবে। অনেকে কলমগুলিকে পাতাসমেত রাখিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে এক দোষ হয় এই যে, পাতা গুলি কলমে সংলগ্ন থাকায় কলমটি

ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তবে কলমের উপরিভাগে দুই একটি থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কলমগুলিকে জমীতে ঈষৎ হেলাইয়া বসাইলে শীঘ্র শিকড় জন্মে। কাটি-কলম কাটিবার রীতি ও জখিরাতে বসাইবার পদ্ধতি বুঝিতে হইলে পরিশিষ্ট দেখুন। *

দ্বিতীয় প্রকারের কাটি-কলম যে প্রণালীতে কাটিতে হয় তাহাও ২ নম্বর ছবি দৃষ্টে বুঝা যাইবে। এই কলমের পক্ষে প্রথমোক্ত সকল বিষয়ই অনুকরণীয়, তবে ইহার জন্য যে শাখার আবশ্যক তাহা কাণ্ড বা শাখার পার্শ্বস্থ হওয়া চাই। ইহাকে Off-shoot বা Side-shoot কহে। মূল গাছ হইতে এই শাখাটীকে এরূপ সাবধানে সতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে যে, তাহার গোড়ায় মূল-শাখা বা কাণ্ডের ছাল কিয়ৎ পরিমাণেও সংলগ্ন থাকে। ইহাতে পাণ্ডিত্য বা কারুকার্য্য কিছুই নাই, তবে কিঞ্চিৎ সাবধানতা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

জোড়-কলম।

(GRAFTING.)

জোড়-কলম উদ্যান কার্য্যের একটী যে কেবল বিশেষ কার্য্য তাহা নহে, ইহা অতীব আনন্দজনক ও উৎসাহবর্দ্ধক। যাঁহারা কখন স্বহস্তে কলম বাঁধিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার আনন্দ উপভোগ

* পরিশিষ্ট, ছবি নং ১।

করিয়াছেন। সাধারণতঃ উদ্যানকার্য্যই আনন্দভরা, কলম প্রভৃতি শিল্পকার্য্য, আরও অধিক আনন্দজনক। যে কার্য্যে শিল্প আছে, যে কার্য্যে নৈরাশ্য বা সাফল্য আছে, তাহা চিরদিনই আনন্দকর। কলম করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ঝড়, বৃষ্টি, বা রৌদ্র হউক, প্রতিদিন অন্ততঃ একবার তাহা দেখিবার জন্য এমনই ব্যগ্রতা জন্মে যে, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কলমে ব্যবসায়ীর অর্থাগম হয়, সৌখীনের গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ লাভ হয়।

জোড়-কলম ও তৎশ্রেণীর চোক প্রভৃতি যে সকল কলম আছে, তদ্বারা গাছের সংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত আরও একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, এইরূপ কলম শীঘ্র ফলবতী হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, চারা বা মূল গাছের (Stock) শিকড় ও কাণ্ড সাহায্যে অপর গাছের শাখা বা চোককে স্বীয় পোষণোপযোগী কোন পদার্থের অভাব অনুভব করিতে না হওয়ায় শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কারণে অনেক বড় বড় গাছকেও অল্পদিন মধ্যে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। যেমন কোন একটী কুল বা পীচ গাছ আছে এবং তাহার ফল অতি কদর্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহার শাখা প্রশাখা কাটিয়া ফেলিয়া, মূলকাণ্ডে যদি অপর ভাল জাতীয় কোন কুল বা পীচের শাখার জোড় লাগাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই বৃক্ষে আর সেই জঘন্য ফল না হইয়া, অল্প দিন মধ্যেই ভাল ফল ফলিতে থাকিবে।

জোড়-কলমের জন্য বীজ বা কাটি-কলমের চারার আবশ্যক। এই চারাটী অন্ততঃ দুই বৎসরের হওয়া চাই, কারণ তাহা না হইলে, উহার কাণ্ড কোমল থাকিবে। এইরূপ এক বা দুই বৎসরের চারা যদি টবে বা গামলায় থাকে ত ভালই, নতুবা তাহাকে টবে তুলিয়া রাখিতে হইবে। পরে, যে গাছের সহিত জোড় বাঁধিতে হইবে, তথায় ইহাকে লইয়া গিয়া, যে শাখাটীর সহিত জোড় বাঁধিবে, সেই থানে উহাকে ভালরূপে স্থাপন করিতে হইবে। শাখাটী যদি অধিক উচ্চে হয় অর্থাৎ জমাতে টব রাখিলে চারা ও শাখার সহজে সংলগ্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে একটী মাচা করিয়া তাহার উপরে চারাটীকে রাখিয়া, চারা ও শাখায় জোড় বাঁধিতে হইবে। চারাপেক্ষা শাখাটীর বয়স বা স্থূলতা অধিক না হয়।

জোড় বাঁধিবার সময়, চারা ও শাখার কাণ্ডের ঈষৎ পরিমাণে কাষ্ঠসমেত ছাল তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে কাটিবার পূর্ব্বে, চারা ও শাখাকে ধীরে ধীরে টানিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন স্থানে উভয়ে ভালরূপে সম্মিলিত হইতে পারে। এইরূপে যেখানে সম্মিলন হওয়া সম্ভব হইল, চারাও শাখার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছুরী দ্বারা দাগ দিয়া উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিতরূপে কাটিতে হইবে। কলম কাটিবার ছুরী তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। সাবধান, যেন কাটিতে গিয়া কাণ্ড না ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা অতিরিক্ত না কাটিয়া যায়। যে স্থান কাটা যাইবে, তাহা ৩।৪ অঙ্গুলি লম্বা হইলেই চলিবে, কিন্তু গভীরতা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে

পারি যে, কাণ্ডের স্থূলতার সিকি অংশ কাটিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি শিল্পীকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। তদনন্তর চারা ও শাখার কর্ত্তিতাংশ একত্রে সম্মিলিত করিয়া ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত এরূপভাবে বাঁধিতে হইবে, যেন সেই জোড়ের ভিতর দিয়া বায়ু সঞ্চালন করিতে না পারে। বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ রোধ করিবার জন্য বন্ধনীর উপরে এঁটেল মাটি উত্তমরূপে লেপিয়া দিতে হইবে। ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ে বৃষ্টিতে তাহা ধৌত হইয়া যায়। এজন্য রজন ও টার্পিনতৈল একত্রে অগ্নিতে গলাইয়া উহাতে প্রলেপ দিলে ভাল হয়। জোড় বাঁধিবার জন্য কঠিন দড়ির পরিবর্ত্তে পাট, পশম, বা কলার ছোটা ব্যবহার করা ভাল। কারণ ইহারা একদিকে যেমন শক্ত, অন্য দিকে তেমনি কোমল; সুতরাং ইহাদ্বারা বাঁধিলে গাছে আঘাতও লাগে না এবং সহজে ছিঁড়িয়া বা পচিয়া যায় না।

আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জোড়-কলম বাঁধিবার উপযুক্ত সময়, কারণ এই কয়েক মাস গাছের শিরা সমুদায় আল্‌গা থাকে এবং রস পাত্‌লা থাকায় অতি সত্বরেই চারা ও শাখার জোড় লাগিয়া যায়। শীতকালে গাছ পালা জড়সড় ও তাহার শিরা সমূহ কুঞ্চিত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত রসও তাদৃশ তরল না থাকায় জোড় মিলিত হইতে বিলম্ব হয়। গ্রীষ্ম-কালে বৃক্ষলতাদির শিরাদি আল্‌গা, এবং রস পাতলা থাকে বটে, কিন্তু এ সময়ে কলম বাঁধিলে ক্ষতস্থান হইতে অনেক

রস শুষ্ক হইয়া যায়, এজন্য এ সময়েও জোড়-কলম করা প্রসিদ্ধ নহে।

চারা ও শাখার স্থূলতা ও কোমলতা, ঋতুর অবস্থা ও শিল্পীর কার্য্য কুশলতানুসারে জোড় সম্মিলিত হইতে ১০ দিন হইতে এক মাস সময় লাগে। জোড় সম্মিলিত হইলে জোড়-স্থানের উপরিভাগস্থিত চারা গাছের অংশটী কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয় এবং তাহা হইলে চারা গাছের সমুদায় রস ও শক্তি শাখাংশে ধাবিত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পোষণ করে। চারা গাছের শিরোভাগ কাটিয়া দিবার ১০।১২ দিবস পর হইতে ১৪।১৫ দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শাখাটীকে মূল গাছ হইতে কাটিয়া সতন্ত্র করিতে হইবে। একবারে কাটিয়া দিলে পাছে শাখাটী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এইজন্য ক্রমে ক্রমে কাটিবার ব্যবস্থা আছে। মূল গাছ হইতে শাখাটীকে কাটিবার পরেও অনেকে চারার শিরোভাগ কাটিয়া দিতে সঙ্কুচিত বা ভীত হয়েন, কিন্তু ইহা বিজ্ঞান ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। চারার উর্দ্ধদেশ না কাটা গেলে, চারাটীর রস চারা গাছেই অধিক ব্যয়িত হয় সুতরাং শাখাটী সংযুক্ত হইতে বিলম্ব হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণে পোষণাভাবে বর্দ্ধিত বা বলিষ্ট হইতে পারে না।*

চারা ও শাখায় সম্মিলিত হইবার পরে মূল গাছ হইতে শাখাটী কাটা হইলেই জোড়-কলম তৈয়ার হইল। এক্ষণে উহাকে ছায়াযুক্ত হাপোরে লইয়া কিছুদিন লালনপালন করিয়া যথা সময়ে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। *

---

* পরিশিষ্ট, ছবি নং ৫।

জিব-কলম ।

(TONGUE—GRAFTING).

চারা গাছে যে কলম বসাইতে হয়, তাহার আকার জিহ্বা সদৃশ, এই জন্য ইহাকে জিব-কলম কহে। 'জিব' কথাটী জিহ্বা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। যে উদ্দেশ্যে জোড়-কলম করা গিয়া থাকে সেই একই উদ্দেশ্য সাধনার্থে চারাগাছের নানা স্থানে নানা প্রকারে অন্য গাছের অংশ সংযোজিত করা যায়। সেই সকল কলমের নামকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পরিণতঃ করা একরূপ অসাধ্য না হইলেও, শব্দগুলি দুর্বোধ্য হইবে ইহা নিশ্চয়। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া ইংরাজি শব্দগুলিই এ স্থানে প্রকটিত হইল। সে গুলি এই:—

Crown or Rind grafting, ও Whip grafting. শেষোক্ত হুইপ-কলমের অন্তর্গত অনেক প্রকার কলম হইয়া থাকে যথা,—Cleft-grafting, Saddle-grafting Side-grafting, Wedge-grafting, Bud-grafting, Bark-grafting, Root-grafting, Herbaceous-grafting ইত্যাদি।

জিব-কলমের নিয়ম এই যে, চারা গাছের মস্তকটা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার উপরিভাগে ইংরাজি V অক্ষরের ন্যায় কাটিতে হইবে। তদনন্তর যে গাছের কলম উহাতে বসাইতে হইবে তাহার ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমাণ শাখা কাটিয়া লইয়া, তাহার নিম্নাংশ এরূপ ভাবে কাটিতে হইবে যে, উহা সেই চারার কর্ত্তিত স্থানমধ্যে

উত্তমরূপে বসিতে পারে। সাবধান, যেন কলম বসাইবার সময় চারার কর্ত্তিত মুখ না ফাটিয়া যায়। তদনন্তর জোড়-কলমের ন্যায় বাঁধিয়া দিতে হইবে। যে কলমটী লাগাইতে হইবে তাহাতে ২।৩টী চোক থাকা আবশ্যক, কারণ সেই চোক মুকুলিত হইয়া শাখা প্রশাখায় পরিণত হইবে।

পূর্ব্বে যেরূপ চারাকে V অক্ষরের ন্যায় কাটিয়া কলমকে তাহার উপযোগী করিয়া কাটিবার কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ কলমটীকেও সেই অক্ষরের ন্যায় কাটিয়া চারাতে বসাইয়া দিতে পারা যায়। *

যাহাকে হুইপ বা সাইড কলম বলে তাহারও কয়েকখানি চিত্র পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। এতদর্থে চারার শিরোভাগ কাটিয়া তাহার গাত্রে এক বা ততোধিক কলম লাগাইতে পারা যায়, তবে চারার কাণ্ডের স্থূলতার উপর উহা নির্ভর করে। সরু চারা হইলে তাহাতে একটী মাত্র কলম বাঁধিতে পারা যায় কিন্তু মূল গাছের কাণ্ড অধিক মোটা হইলে সেই কাণ্ডের চারি দিকে ২টী হইতে যত স্থান পাওয়া যায়, ততই কলম লাগাইতে পারা যায়। একই কাণ্ডে এক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গাছের কলম লাগাইতে পারা যায়। †

---

* পরিশিষ্ট, ৪, ৫, ও ৬ নং চিত্র।

† ৭, ৮, ৯ নং ঐ—ঐ।

চোক-কলম।
(BUDDING).

পীচ, কুল প্রভৃতি ফলের অাঁটি বা বীজ অতিশয় কঠিন, এজন্ত ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাধারণতঃ Stone fruit কহে। যে সকল ফলের বীজ এইরূপ কঠিন তাহাদিগের কলম করিবার পক্ষে চোক-কলম প্রশস্ত। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল গাছ অতিশয় আটাময় এবং কীটের আবাস স্থান বলিলেও হয়। ফলকর গাছের পক্ষে আটা নির্গমনের ন্যায় আর কোন কঠিন রোগ নাই, সুতরাং যখন ইহা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, তখন আর ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে ক্ষত করিয়া সেই রোগকে আনয়ন করা কোনমতে উচিত নহে। যেখানে ক্ষত ও অস্ত্রাঘাত সেইখানেই এই রোগ উপস্থিত হইবার চেষ্টা করে, এবং ক্ষত বা আঘাত যত অধিক ও গভীর হইবে, ততই ইহার প্রাদুর্ভাবের বিশেষ সম্ভাবনা। এই কারণে উল্লিখিত জাতীয় ফলকর গাছের জোড়-কলম বা তজ্জাতীয় কোন প্রকার কলমাপেক্ষা চোক-কলম করাই অনেকটা নিরাপদ। এতদ্ব্যতীত অন্য জাতি অপেক্ষা এই জাতীয় গাছ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রস নির্গত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন জোড় বাঁধিবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। এইরূপ অপরিমিত রসপ্রবাহে কলম প্লাবিত হয়, সুতরাং জোড় লাগিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায় কলমটী ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়।

চোক-কলমের আর একটী সুবিধা এই যে, প্রত্যেক চোক হইতেই এক একটী সতন্ত্র গাছ হইতে পারে এবং একই গাছে যত প্রকার বা যতগুলি ইচ্ছা চোক বসাইলে অতি অল্পদিন মধ্যে সেই গাছ ঝাড়বিশিষ্ট হইয়া নানাবিধ ও বিস্তর ফল প্রদান করিবে। একটী পীচ, বা কুল গাছের শাখা প্রশাখা ছাঁটিয়া যদি প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় নানাজাতীয় পীচ বা নানা জাতীয় কুলের চোক বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে একটী পীচ গাছে নানাজাতীয় পীচ অথবা একটী কুল গাছে নানা-জাতীয় কুল ফলিবে। মুরসিদাবাদ থাকিতে রৈইসবাগের কয়েকটী গাছে আমি এইরূপে চোক বসাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে দুই একটীর নাম করিতেছি;—পীচ ও গোলাপ ফুলের গাছ। প্রথ-মতঃ একটী পীচ গাছে তিন জাতীয় তিনটী পীচের চোক বসা-ইয়াছিলাম। ১৫।২০ দিন মধ্যে সেইগুলি মুকুলিত হইয়া শাখায় পরিণত হইল। এক বৎসর মধ্যে তিনটী শাখায় তিন রকম ফল হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ২।৩টী গোলাপের গাছে যথাক্রমে দশ কি বারটী করিয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপ-ফুলের চোক বসাইয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ সকলগুলিই ক্রমে ফুল প্রদান করিয়াছিল এবং একটী গোলাপ গাছে নানাজাতীয় গোলাপ ফুটিতেছে দেখিয়া দর্শক মাত্রেই,—বিশেষতঃ মহামান্য নবাব ছোট সাহেব (Fluk kudr Nawab Syed Nasir-Ali Mirza Bahadur) বাহাদুর বিশেষ বিমোহিত হইয়াছিলেন। রৈইসবাগে এক্ষণে সেই সকল গাছ আছে কি না জানি না।

ফাল্গুন মাস হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চোক-কলম করিবার সময়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও আবার ইতরবিশেষ আছে। এই সময়ে উদ্ভিদ সকল শীতের জড়সড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া নব মুকুলিত হইতে থাকে। গাছের শিরা সকল প্রফুল্লিত এবং শাখা প্রশাখার ছাল কাষ্ঠ হইতে সতন্ত্র হইয়া থাকে। এইজন্য চোক-কলম করিবার জন্য কাষ্ঠ (Wood) হইতে ছালকে (bark) সহজেই পৃথক করিতে পারা যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিনে চোক-কলম করিলে কোমল চোকগুলি প্রায় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দুই মাস মধ্যে চোক-কলম করিতে হইলে বিশিষ্টরূপ ছায়াযুক্ত স্থান আবশ্যক। এই রৌদ্রের দিনে জমীতে রোপিতগাছে চোক বসাইতে হইলে,—সম্ভব হইলে গাছটীকে,—নতুবা কলমের স্থানটীকে উত্তমরূপে দিবাভাগে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক।

চোক-কলমের জন্য ইতিপূর্ব্বে যে ছুরীর কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহা আবশ্যক হইবে। ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকল গাছেই চোক (Bud) বসান যাইতে পারে। প্রথমে ছোট চারার কথা বলা যাউক। চারা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সকল কলমেরই এক নিয়ম। গাছটী অন্ততঃ এক বৎসরের এবং যে যে স্থানে চোক বসাইতে হইবে তাহা অর্দ্ধ পরিপক্ক হওয়া আবশ্যক। স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া অপর গাছ হইতে সুপুষ্ট ও অর্দ্ধ-পরিপক্ক চোক তুলিয়া আনিতে হইবে। চোক তুলিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ছুরী লইয়া মনোনীত শাখাস্থিত

চোকের উপরে ও নিম্নভাগে অর্দ্ধ ইঞ্চ ছাল বা কাষ্ঠসমেত ছাল, লিখিবার কলমের ন্যায় ঈষৎ হেলাইয়া কাটিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর চোকটী লইয়া ভিজা কাপড় বা জলপূর্ণ কোন পাত্রে বা মুখের মধ্যে রাখিয়া কলম করিবার স্থানে আসিয়া চারাকে কাটিতে হইবে। চোক উঠান অপেক্ষা কলম বসাইবার স্থানটী কাটিতে বিশেষ নৈপুণ্য আবশ্যক। চারা বা গাছের যে স্থানটীতে চোক বসিবে তাহা নিতান্ত নূতন অথবা রুগ্ন বা শুষ্কপ্রায় না হয়। এই স্থানটীকে ইংরাজি T অক্ষরের ন্যায় ছুরীর দ্বারা ছালের উপরে সাবধানে দাগ দিতে হইবে। পরে ছুরীর সূক্ষ্ম বাঁট-দ্বারা ধীরতার সহিত কাষ্ঠ হইতে ছালটীকে খুলিয়া তন্মধ্যে চোকটীকে সাবধানে বসাইতে হইবে। অনেকে গাছ হইতে চোক তুলিয়া লইয়া ছালের পশ্চাদ্ভাগস্থিত কাষ্ঠাংশকে সতন্ত্র করিয়া দিয়া, চোক সমেত ছালটীকে বসাইয়া দিয়া থাকেন। আবার অনেকে কাষ্ঠ-সমেতও বসাইয়া দেন, কিন্তু ফলে কোন বিশেষত্ব নাই, তবে কাষ্ঠ হইতে ছালকে সতন্ত্র করিতে পাছে চোকের কোন অনিষ্ট ঘটে, এই কারণে কাষ্ঠ-সমেত-ছাল বসান গিয়া থাকে। কেহ কেহ বা চোক বসাইবার জন্য গাছে T অক্ষরের ন্যায় দাগ না দিয়া কেবল একটী লম্বা সরল দাগ দিয়া উভয়পার্শ্বের ছাল উঠাইয়া তন্মধ্যে চোক প্রবেশ করাইয়া দেন। শেষোক্ত মতে সরল দাগ দিয়া তাহার ছাল উঠান এবং তন্মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে চোক প্রবেশ করান অধিকতর নৈপুণ্য ও সাবধানতার কার্য্য। কিন্তু এই

প্রথাই যে প্রকৃষ্ট তাহা আমি স্বীকার করি, কারণ লম্বাভাগে চিরিলে গাছের শিরা অতি অল্পই কাটিবার সম্ভাবনা, কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীতে কাটিলে অনেকগুলি শিরা কাটিয়া যায়। এবং বর্ষার জল তাহাতে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিবার পথ পায়। যাহা হউক, চোকটীকে কাষ্ঠ ও ছালের মধ্যে উত্তমরূপে প্রবেশ করাইয়া, তাহার উপরে ছালটী ভালরূপে পাড়িয়া দিবে। তদনন্তর কোমল রজ্জু অর্থাৎ পশম, বা নরম সূতা দ্বারা সেই স্থানটী জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বন্ধনকালে চোকটী ছাল দ্বারা না ঢাকিয়া যায়, অথবা বন্ধন মধ্যে না পড়ে। কলম বাঁধা হইয়া গেলে, সেই স্থানটীতে কলমের মলম লাগাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। মলমের প্রস্তুত প্রণালী জোড়-কলম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন স্থানে চোক থাকে, ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক পত্র-গ্রন্থির ক্রোড়ে চোক থাকে এবং প্রত্যেক চোকই ভাবী শাখা। অনেকে পত্র সম্বলিত চোকও উঠাইয়া চোক-কলম করেন। ইহাতে চোকের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ স্বয়ং চোকই প্রথমাবস্থায় অপর গাছের সাহায্যাভিলাষী, তখন আবার তাহার সহিত পত্র থাকিলে তাহাকে পোষণ করা ক্ষুদ্র ও কোমল চোকের পক্ষে অসম্ভব।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চোক কলমের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সমাধা করিতে পারিলে, ১০।১২ দিনের মধ্যে উহা ফুটিয়া

পল্লবিত হইবার উপক্রম করে। চোক বসাইবার পরে এবং যাবৎ উহা সজীব হইয়া না উঠে, তাহার মধ্যে সূর্য্যোত্তাপ প্রখর হইলে কলমের স্থানে তুলা বা সেওলা,—যে সেওলা পাহাড়ে জন্মে (Moss),—দ্বারা ঢাকিয়া রাখায় লাভ আছে। *

চোঙ-কলম।

TUBE-GRAFTING.

চোঙ-কলমকে ইংরাজিতে Tube, Ring বা Flute grafting কহে। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থে চোক্-কলম করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই ইহাও চলিত হইয়াছে। চোক ও চোঙ কলম করিবার রীতি প্রায় একই রকম। ফুল গাছের জন্য প্রায়ই চোঙ-কলম করিতে হয়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, এই তিন মাসই চোঙ-কলম করিবার প্রশস্ত সময়।

এক গাছের শাখা হইতে চোঙ বা নলের আকারে ছাল তুলিয়া অপর গাছের কাণ্ড বা শাখার কাষ্ঠে উহাকে যথা নিয়মে বসাতে হয়। যে গাছ হইতে চোঙ তুলিতে হইবে সেই গাছ বা তাহার কোন শাখার মস্তকটী একবারে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে এক বা দুই ইঞ্চ্ নিম্নে ডালটী বেষ্টন করিয়া, ছুরীদ্বারা কাষ্ঠ স্পর্শ করতঃ দাগ দিতে হইবে। তদনন্তর

* পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১০।

সেই স্থান-পরিমিত ছালকে দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া দুই চারিবার ঘুরাইতে চেষ্টা করিলে কাষ্ঠ হইতে ছাল পৃথক হইয়া পড়িবে। তখন তাহাকে উঠাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে যে ডালে সেই চোঙটীকে বসাইতে হইবে, সেই ডালটির মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া কর্ত্তিত স্থানের উপর হইতে চোঙের পরিমাণ মত নিম্ন-দিকে বেষ্টন করিয়া একটী দাগ দিয়া, সেই স্থানের ছাল অংশ সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া, কাষ্ঠের উপরে চোঙটী প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, চোঙে একটী বা দুইটী চোক থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

অন্য এক প্রণালীতে গাছ হইতে চোঙ তুলিতে পারা যায় এবং তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্রণালীমতে চোঙ তুলিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চোখের গাছের মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া ডাল বেষ্টন করিয়া যথারীতি একটী দাগ দিতে হইবে। পরে উপরিভাগ হইতে দাগ পর্য্যন্ত ছুরী দ্বারা লম্বাভাগে আর একটী দাগ দিয়া চোক-কলমের ছুরী সাহায্যে ধীরে ধীরে ছাল খানি খুলিয়া লইয়া অন্য চারার বা শাখার মস্তকহীন কাণ্ডের কাষ্ঠে যথা নিয়মে বসাইয়া দিতে হইবে। যে গাছে চোঙ বসাইতে হইবে তাহার কাণ্ড যদি চোঙ অপেক্ষা মোটা বা সরু হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। চোঙ অপেক্ষা কাণ্ড মোটা হইলে কাণ্ডের সমুদায় ছাল না তুলিয়া নিম্নলিখিত প্রকারের কাটা চোঙটী তাহাতে বসাইয়া পরিমাণ করিয়া, দেখিতে হইবে চোঙটী তাহাতে সঙ্কুলান হয় কি না। যদি না হয়, তাহা হইলে যত

টুকুতে সঙ্কুলান হয় ততটুকু স্থানের ছাল, কাণ্ড হইতে তুলিয়া বসাইয়া দিতে হয়। আবার যদি কাণ্ড চোঙ হইতে বড় হয়, তাহা হইলে উহার একদিক লম্বাভাগে চিরিয়া কাণ্ডের কাষ্ঠে বসাইয়া, ছালের অতিরিক্ত অংশ ছালের উপরে রাখিতে হইবে।

যে কোন প্রকারে হউক, চোঙ বসান হইলে চোক্-কলমের ন্যায় যথানিয়মে বাঁধিয়া কার্য্য শেষ করিতে হইবে। চোঙ যে কেবল কোন চারা বা শাখার শিরোদেশে অথবা শির-শ্ছেদন করিয়া তাহাতে বসাইতে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। শাখা প্রশাখার যে কোন অংশেই চোঙ বসান যাইতে পারে। তবে শিরোদেশ ভিন্ন অপর কোন স্থানে বসাইলে তাহাকে প্রায় রিং-কলম কহে। রিং বসাইতে হইলে শেষোক্ত প্রণালী মত চোঙকে চিরিয়া শাখায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। আর যে স্থানে উহাকে বসাইতে হইবে তথাকার চোঙের পরিমিত স্থানের ছাল তুলিয়া ফেলিতে হয়।*

গুটী বা গুল-কলম।

যে সকল কঠিন ও অর্দ্ধ-কঠিন কাষ্ঠবিশিষ্ট গাছের অন্যবিধ কলম হওয়া সুবিধা হয় না, এইরূপ গাছেরই গুটী-কলম হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ঘন আটাবিশিষ্ট গাছের কলম গুটীতে জন্মে

* পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১১।

না। তাহার কারণ এই যে, শাখা প্রশাখায় অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র অপরিমিত আটা নির্গত হইয়া ছাল মধ্যস্থিত কর্ত্তিত-শিরা সমুদায়ের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাতে আর শিকড় নির্গমনের পথ থাকে না। কোমল ছাল ও কাষ্ঠ যুক্ত গাছের গুটী-কলম অতি শীঘ্র তৈয়ার হয়।

বর্ষাকালই এই কলমের প্রশস্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বা আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ভাদ্র মাসের শেষ সময় মধ্যে গুটী বাঁধিলে,—গাছের কাষ্ঠের কোমলতা বা কাঠিন্য অনুসারে,—১৫ দিন হইতে একমাসের মধ্যে গুটী ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হইয়া থাকে।

অঙ্গ-পরিপুষ্ট শাখাতে গুটী বাঁধিতে হয়। শাখামুখের অধিক নিম্নে গুটী বাঁধিলে শিকড় জন্মে সত্য, কিন্তু গাছ হইতে কলমটি সতন্ত্র করিয়া লইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল শিকড় সকল সে গাছটিকে উপযুক্ত পরিমাণে রস যোগাইয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং গাছটী রসাভাবে শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন্ স্থানে গুটী বাঁধা উচিত, প্রথমে তাহাই জানা আবশ্যক। শাখাটী রুগ্ন বা শীর্ণ এবং ঊর্দ্ধগামী না হয়,—অতিশয় নূতন বা ভাল পাতা বিশিষ্ট না হয়, ইত্যাদি দেখিয়া শাখা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ঊর্দ্ধগামী শাখার কলম তৈয়ার হইতে বিলম্ব হয়, এবং এরূপ কলমে ফল হইতেও বিলম্ব হয়, সুতরাং মূল কাণ্ডের শাখা প্রশাখাতেই কলম বাঁধা উচিত। এইরূপ শাখা প্রশাখার মধ্যে আবার যে

গুলি নতমুখী তাহাতে গুটী বাঁধিলে অতি শীঘ্র শিকড় জন্মে এবং অল্পদিন মধ্যে ফলধারণ করে।

উল্লিখিত বিষয় সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাখা নির্ব্বাচন করতঃ কলম্ বাঁধিতে অগ্রসর হইবে। গুটী-কলম বাঁধিবার জন্য ছুরী, দড়ি বা সূতা, নারিকেল ছোব্ড়া বা মস (moss) এবং ভাল মাটির আবশ্যক। নারিকেল ছোবড়া ও মসের কার্য্য একই, তবে মস্ দিয়া কলম বাঁধিলে, উহাতে জল দিলে নারিকেল ছোব্ড়া অপেক্ষা অধিকক্ষণ ভিজা থাকে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে মস্ সংগ্রহ করা সুবিধাজনক নহে, কারণ উহা শীত-প্রধান পাহাড়ে জন্মে এবং সকল সময়ে পাওয়া যায় না, এই জন্য দেশী উপাদানই গ্রাহ্য। তাহার পর মাটির বিষয়। মালি ও তৎশ্রেণীস্থ ছারাওয়ালাগণ গুটীতে প্রায় কঠিন এঁটেল মাটি ব্যবহার করে, কিন্তু ইহা অতিশয় ক্ষতিকর এবং বিজ্ঞান ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এঁটেল মাটি স্বভাবতঃ কঠিন এবং নবাঙ্কুরিত কোমল শিকড়ের পক্ষে একরকম দুর্ভেদ্য। এতদ্ব্যতীত গুটী বাঁধিলে সেই মাটি আরও কঠিন ও দুর্ভেদ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং প্রথমতঃ শিকড় জন্মিতেই পারে না এবং যদিও অতি কষ্টে জন্মে, তথাপি মৃত্তিকা ভেদ করিতে না পারায় গুটী অসম্পূর্ণ থাকে। অতএব তাহাতে কোন কাজই হয় না। আবার অনেকে অনেক আড়ম্বর করিয়া গুটির জন্য মাটি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, যথা,—পচা-মাচ, খৈইল-পচা, ভেড়ী-সার ইত্যাদি মাটির সহিত মিশ্রিত করেন। গুটির পক্ষে এত সার-বিশিষ্ট

মাটি আদৌ আবশ্যক করে না, কারণ সার-বিশিষ্ট মাটির লোভে অঙ্কুর নির্গত হয় না এবং কোমল শিকড়ের উহা এক্ষণে আবশ্যক হয় না। বিনা মাটিতে আমরা গুটি করিয়া বারম্বার সাফল্য লাভ করিয়াছি। বিনা মাটিতে যে গুটি করা যায়, তাহাতে নারিকেল ছোবড়া বা মস্ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয় এবং তাহাকে নিরন্তর ভিজাইয়া রাখা চাই। সর্ব্বদা যথেষ্ট পরিমাণে ভিজাইয়া রাখিতে সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া মাটি ব্যবহার করিতে হয়।

এক্ষণে গুটি বাধা যাউক। নির্ব্বাচিত শাখাটি বাম হস্তে ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সুতীক্ষ্ণ ছুরী দিয়া উপযুক্ত স্থানের পরিধি বেষ্টন করিয়া দাগ দিয়া, সেই দাগের ১ বা ১॥ ইঞ্চ উচ্চ বা নিম্নে আর একটি সেইরূপ দাগ দিতে হইবে! তদনন্তর উভয় দাগের ভিতর লম্বাভাগে আর একটী দাগ দিয়া ধীরে ধীরে সেই অংশের ছাল খানি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ছাল উঠাইতে কাষ্ঠে না আঘাত লাগে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এই-বার সেই ছাল-হীন স্থানটি উত্তম দো-আঁশ মাটি দ্বারা এক ইঞ্চ আন্দাজ পুরু করিয়া ঢাকিয়া দিয়া, তাহার উপরে নারি-কেলের ছোবড়া দিয়া কলা-গাছের ছোটা বা শক্ত লক-লাইন দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া দিলেই গুটি বাঁধা হইল। শাখার স্থূলতা ও গাছের স্বভাবানুসারে গুটী ছোট, বা বড় করিতে হয়। শাখা সূক্ষ্ম বা কোমল হইলে ছোট, এবং স্থূল ও কঠিন হইলে অপেক্ষা-কৃত বড় গুটী করিতে হয়। এরূপ গুটীর আকারের যে তারতম্য

করিতে হয়, তাহার দুইটী কারণ আছে। সরু শাখার, ছোট গুটীতেই কলমের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, পরন্তু উহাতে বড় গুটী করিলে তাহার ভারে শাখাটি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। স্থূল শাখাও কঠিন গাছে ছোট গুটী হইলে কলমের রসাভাব হওয়া সম্ভব, এবং রসাভাব হইলে গুটী হইতে শিকড় নির্গমনও অসম্ভব। এই সকল কারণে শাখা বা গাছের স্বভাব ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া গুটীর আকার ছোট বা বড় করিতে হইবে। শেষোক্ত প্রকার গাছের গুটীকে সর্ব্বদা ভিজা রাখিবার জন্য উহাতে ঝারা দেওয়া আবশ্যক। হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, বৈশাখ মাসে বিগ্রহ ও তুলসী গাছের মস্তকোপরি ঝারা দেওয়া হইয়া থাকে। সেইরূপ ঝারা গুটীতে দিবার ব্যবস্থা আছে। অহিন্দু পাঠকের অবগতির জন্য পরিশিষ্টে উহার ছবি দেওয়া গেল।*

বিনা মাটি সাহায্যে যে গুটী বাধিবার কথা বলা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত কার্য্য প্রণালী ব্যতীত অধিক বলিবার কিছুই নাই। সরু বা কোমল শাখাতে যে গুটী করা যায়, তাহাতে মাটির পরিবর্ত্তে কেবল মস্ বাধিয়া দিলেই চলিবে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা ভিজা থাকা আবশ্যক।

যথাসময়ে গুটী ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হইলে কোন কোন স্থলে তাহার উপরে দ্বিতীয়বার মাটি ও নারিকেল ছোবড়া বাঁধিয়া দেওয়া রীতি আছে। কোমল শাখাবিশিষ্ট গাছে ইহা

* পরিশিষ্ট চিত্র নং ১২।

আবশ্যক হয় না, কিন্তু কঠিন কাষ্ঠযুক্ত গাছে দ্বিতীয় বার ঐরূপে গুটীকে ঢাকিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই বরং ভালই হয়। না দিয়াও বিশেষ ক্ষতি আমরা উপলব্ধি করি নাই।

গুটী ভেদ করিয়া দুই একটী শিকড় বাহির হইলেই উহাকে না কাটিয়া, কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিয়া আরও শিকড় জন্মিতে দেওয়া উচিত। গুটীর বাহিরে শিকড় দেখা গেলে রৌদ্রের উত্তাপ হইতে উহাকে বাঁচাইবার জন্য গুটীর উপরে আচ্ছাদন করিতে পারিলে ভাল। দ্বিতীয়বার গুটী করিবার কথা যে উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ইহাও একটী প্রধান কারণ। যাহা হউক, উপযুক্ত পরিমাণে শিকড় জন্মিলে গুটীর নিম্নে একবার 'ছে' দিয়া তাহার ৭।৮ দিন পরে মূল গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া, অপরাপর কলমের ন্যায় হাপোরে কিয়দ্দিন রাখিয়া পালন করিতে হইবে। গাছ হইতে গুটী কাটিয়া আনিয়া হাপোরে বসান হইলে, কয়েক দিবসের মধ্যে কলমের পাতাগুলি ঝরিয়া যায় এবং যথাসময়ে আবার নূতন শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া থাকে। যাবৎ জমীতে বসাইবার আবশ্যক না হয়, তাবৎ উহাকে হাপোরে থাকিতে দেওয়া উচিত। যদি উহাকে টবে বা গামলায় রোপণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, হাপোরে না বসাইয়া টবেই বসান চলে, কিন্তু টবে বসাইলেও, গাছ সমেত টবটীকে বৃক্ষচ্ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া হাপোরের চারার ন্যায় পালনীয়।

দাবা-কলম।

LAYERING.

গুটী কলমের সহিত দাবা-কলমের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। গুটী-কলমের যেমন শাখা হইতে ছাল তুলিয়া মাটী বাধিয়া দিতে হয়, এই কলম করিতেও ঐরূপে ছাল তুলিয়া গাছের সেই স্থানটী হেলাইয়া জমীতে মাটি চাপা দিতে হয়। কার্য্যের সুবিধার জন্য কিন্তু এই প্রণালীর কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। উপরে যে প্রণালীর কথা বলা গেল, তাহাই সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শাখার কোন স্থানের ছাল একবারে তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানটীতে মাটি চাপা দিতে হয়। চারাটী যদি লম্বা, নরম ও সহজেই নমনীয় হয়, তাহা হইলে উহাকে ধীরে ধীরে টানিয়া জমীতে শুয়াইয়া কাষ্ঠ বহির্গত স্থানটিতে ২ ইঞ্চ পরিমাণ মাটি চাপা দিতে হয়। শাখাটী কঠিন হইলে জোর করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা পায়, সুতরাং মাটি-চাপা স্থানের উপরে একখানি ইষ্টক চাপা দিলে, উহার আর জোর করিয়া উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। গাছের কাণ্ড যদি কঠিন হয়, অথবা কলম করিবার পরে, মাটিতে রসাভাব হয়, তাহা হইলে সেই মাটি-চাপা-স্থানের উপরে একটি ছিদ্র-তলা-বিশিষ্ট গামলা বা টব বসাইয়া মধ্যে মধ্যে উহাতে জল পূরিয়া দিলে মাটি আর শুষ্ক হইতে পারে না, ফলতঃ কলমের ও রসাভাব হয় না।

শাখা বেষ্টন করিয়া ছাল না উঠাইয়াও, অন্য উপায়ে দাবা করিতে পারা যায়। সে প্রণালী এই :—শাখার পরিধি বেষ্টন

করিয়া না ছাল তুলিয়া, কলম-স্থানের শাখার নিম্নভাগে ঈষৎ হেলাইয়া ছুরীকে এরূপভাবে শাখা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে যে, ছাল ভেদ করিয়া কাষ্ঠেরও কিয়দংশ কাটিয়া যায়। অনভিজ্ঞ লোকের হাতে অনেক সময়ে শাখার পূর্ণপরিধি ভেদ করিয়া ছুরী চলিয়া যায়। যাহাতে এরূপ না ঘটে, এজন্য অতি ধীরভাবে অস্ত্র চালাইতে হইবে। মনোমতরূপ শাখাটি কলমবৎ কাটা হইলে, সেই স্থানটি < এইরূপে ফাঁক করিয়া উভয় বাহুর সম্মিলিত কোণে ১ বা ২ সূতা মোটা একটী কাটি আট্‌কাইয়া দিতে হইবে। কাটি আট্‌কাইয়া দিলে দুই মুখ আর সম্মিলিত হইতে পারে না। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত মতে যথানিয়মে মাটি চাপা দিয়া কলমের কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

কলম-সম্ভাবী শাখা মাটি হইতে অধিক উচ্চে থাকিলে উহাকে জমীতে নত করা সম্ভব নহে। অতএব এরূপ শাখার জন্য মাটি-পূর্ণ টব বা গামলা আবশ্যক এবং সেই গামলাকে যথাস্থানে রাখিয়া যথানিয়মে কলম কাটিয়া উহার মধ্যে মাটি চাপা দিতে হইবে।

আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিনের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত দাবা-কলম করিবার উপযুক্ত সময়। ২০।২৫ দিনের মধ্যে উহার শিকড় জন্মে কিন্তু অন্ততঃ একমাস অপেক্ষা না করিয়া উহাকে মূল গাছ হইতে কাটিয়া সতন্ত্র করা উচিত নহে। কলম তৈয়ার হইলে অন্যান্য কলমের ন্যায় ইহাকে পালন করিবে।*

* পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১৩।

তৃতীয় অধ্যায়।

গাছ ছাঁটিবার উদ্দেশ্য।

এদেশে গাছ ছাঁটিবার প্রথা যে নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে। তবে কোন সময়ে অথবা কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা নিরাকরণ করা যায় না। ভারতীয় ব্যাপারের কোন বিষয়েই মূল অন্বেষণ করিয়া পাওয়া দুষ্কর অথবা পাওয়া যায় না। বিদেশীয় বা বিজাতীয় কোন একটা ঘটনা অবলম্বন না করিলে কার্য্যারম্ভের একটি বিশেষ অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, এজন্য হয় আমাকে বলিতে হইবে, গাছ পালা ছাঁটিবার প্রথা এদেশে বিলাতের আমদানী, না হয়, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা ইহার সূত্র কোথায় জানি না, বা জানিবার উপায় নাই। যাহাই হউক, সেই বিষয় লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় আমার মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিয়া কোন ফল নাই, অথবা সহৃদয় পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করা উচিত মনে করি না।

গাছ ছাঁটিবার প্রথা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল তাহা জানিতে হইলে মেঃ D. T. Fish নামক জনৈক সুবিখ্যাত ফল-তত্ত্বজ্ঞ সাহেব কি লিখিয়াছেন পাঠ করুন। নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"Science and practice, for it is both of prunning are said to have originated in the necessities of a

donkey, and a good deal in their past history seems redolent of their origin. The story goes that the poor beast fell into a pit and that to keep himself from starving he cropped close the overhanging vines as far as he could reach. Next year the produce of the cropped vines were of extraordinary size and of unusual quality. The illustration was too striking and the demonstration clear to be overlooked."

গাছ ছাঁটিবার প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে মেঃ ফিস সাহেব মোটের উপর বলেন এই যে, একটা ডোবা মধ্যে একটা খচ্চর পড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহা হইতে উঠিতে না পারায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই ডোবার উপরে দোদুল্যমান দ্রাক্ষা-লতাকে মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে। পর বৎসর সেই দ্রাক্ষা-লতা অপরিমিত শাখা পল্লবে সুশোভিত হইয়া অজস্র ও উৎকৃষ্টতর ফল প্রদান করে। উদ্যানস্বামী এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন এবং সেই অবধি প্রতিবৎসরই নানা বৃক্ষ লতাকে ছাঁটিয়া থাকেন। পরে এই প্রথা ক্রমে ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইল।

আমরা যে গাছপালা ছাঁটিয়া থাকি, তাহার যে কোন একটা উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। লোকে গাছ ছাঁটে,—ছাঁটিবার প্রথা প্রচলিত আছে এই কারণেই অনেক সময়ে লোকে গাছ ছাঁটিয়া থাকে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে গাছ ছাঁটিয়া থাকে, গাছ ছাঁটি-

বার দ্বারা কি ফললাভ হইবে, ইহা যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে ফল বিপরীত হয়। গাছের শাখা প্রশাখাকে উদ্দেশ্য-হীন হইয়া নিষ্ঠুরভাবে ছাঁটিলে গাছের কোন উপকার না হইয়া ঘোর অপকার হইয়া থাকে, কিন্তু এই ব্যাপারই প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। যাঁহারা আদৌ গাছ ছাঁটেন না তাঁহারা বরং এক প্রকার ভালই করেন, কেন না অজ্ঞভাবে গাছপালাকে ছাঁটিয়া অনর্থক তাঁহারা গাছের বৃদ্ধি, শ্রী, বা উর্ব্বরতা নষ্ট করেন না। অপরন্তু যাঁহারা গাছ ছাঁটিয়া থাকেন অথচ তাহার উদ্দেশ্য বা প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারা উপকার না করিয়া অপকার করেন।

গাছকে ফলবতী বা তাহার বৃদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে রোধ করিবার জন্য যাঁহারা গাছ ছাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রম করেন। ইহাতে গাছ ফলবতী না হইয়া, উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। গাছ বর্দ্ধনশীল হইলে ফলবতী হইবার পক্ষে অনিশ্চিত। একদিকে যেমন গাছকে ছাঁটিয়া দিলে আপাততঃ তাহার গতিরোধ হইয়া থাকে, অন্য দিকে তেমন কিছুদিন পরে ফলণের শক্তি হ্রাস করিয়া অধিকতররূপে শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া সুবৃহৎ আকার ধারণ করে। শাখা প্রশাখার সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ফলনের আশা তত কমিয়া যায়। তথাপি কিন্তু ইহার প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া লোকে গাছ ছাঁটিতে বিরত হয় না। ছাঁটা ভিন্ন গাছকে ফলবতী করিবার অন্য উপায় আছে। ছাঁটা দ্বারা গাছপালার আকার পরিবর্ত্তন ও নিয়মিত করিতে

হয়,—গাছের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে গাছ ছাঁটিতে হয়,—গাছের রোগ নিবারণ করিতে হইলে রুগ্ন অংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। অনিয়মিতরূপে গাছ ছাঁটিলে তাহার শিকড় সকল অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। শিকড়ের বৃদ্ধিতে উহার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি লাভ করে এবং শাখাদির বৃদ্ধিতে গাছের ফলপ্রদান শক্তি হ্রাস হয়। শিকড় যত বাড়িতে থাকে, গাছের ফল-প্রদান শক্তি তত কমিয়া যায়, ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে গাছকে ফলবতী করিবার জন্য শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়,—অতিরিক্ত শাখা প্রশাখার উপরিভাগও অল্প পরিমাণে ছাটা আবশ্যক। যেখানে শাখা প্রশাখাকে ছাঁটিবার আবশ্যক না থাকে, সে স্থলে বর্দ্ধনোন্মুখী শাখাগুলিকে জমীর দিকে এরূপে টানিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে যে, উহারা সহজে আর না উঠিয়া পড়ে। এইরূপে শাখাগুলিকে টানিয়া বাঁধিয়া দিলে উহাদিগের যে সমুদায় শাখা-প্রসবিনী চোক (Buds) থাকে, তাহা ফলপ্রসবোন্মুখী হইয়া ফল প্রদান করে।

শিকড় ছাঁটিবার প্রথা।

যে গাছের মুকুলিত হইবার যে সময়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে উহাদিগের শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছে মুকুল উদগত হইবার অথবা তাহাতে নূতন শাখা প্রশাখা জন্মিবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে গাছের গোড়ার মাটি বিস্তৃত ও গভীর করিয়া

খুঁড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে অনেক গাছের সূক্ষ্ম শিকড় মাটি খুঁড়িবার কালেই কাটিয়া যায়। তাহার পর কতকগুলি মোটা শিকড়ও কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের যে সকল শিকড় মৃত্তিকার নিম্নদেশে চলিয়া যায়, তাহাদিগকে মূল শিকড় (Tap root) কহে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যতই ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া যায়, গাছ ততই লম্বা হয় এবং তাহার ফল প্রসবিনী শক্তির হ্রাস ততই হইতে থাকে। উপরিভাগের (Superficial or lateral) শিকড়গুলি পার্শ্বদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ফল উৎপাদনে ইহারা গাছের প্রধান সহকারী .সুতরাং ইহারা যাহাতে মৃত্তিকার অধিক অভ্যন্তরে না প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সূক্ষ্ম শিকড়গুলি মৃত্তিকার অল্প নিম্নে ভাসমান রাখিতে হইলে, উহাদিগকে উল্লিখিতরূপে মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ গাছে মুকুল হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। জমীতে সচরাচর লাঙ্গল দিয়া বা উহাকে কোদালদ্বারা কোপাইয়া জমীর উপরিভাগের মাটি আল্‌গা রাখিতে হইবে। মাটি কঠিন ও রসহীন্ হইয়া গেলে সেই সকল শিকড় মৃত্তিকার নিম্নদেশ হইতে আহার অন্বেষণ করিবার জন্য উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়। এই জন্য শিকড়গুলি যাহাতে মৃত্তিকায় অধিক নিম্নে না যাইতে পারে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শিকড়গুলিকে নিয়মিতরূপে পরিচালন করিতে পারিলে গাছের বৃদ্ধির গতি কতক পরিমাণে রোধ হয়, তন্নিবন্ধন উহার ফল প্রসবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়।

গাছ ছাঁটিবার প্রণালী।

যখন গাছ ছাঁটিতে হইবে, তখন তাহার ভাবী আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন শাখাটী ছাঁটা আবশ্যক, কোন শাখাটীর কোন স্থানে কাটা উচিত এই সকল বিষয়ও বিশেষ লক্ষ্যনীয়।

গাছের আকার যন্ত্রের মুখে, কেন না, যে আকারে গাছটীকে পরিণত করিতে হইবে তদনুরূপ যন্ত্রকেও পরিচালনা করিতে হইবে। অবিবেচনার সহিত যথেচ্ছা কাটিলে গাছের আকার বিকৃত হইয়া যায়, ফলনের ইতরবিশেষ হয়, এবং গাছও ঘন বা অতিশয় পাত্‌লা হইয়া যায়।

গাছের অনাবশ্যকীয় ও রুগ্ন শাখাকে একবারে কাটিয়া দেওয়া যেমন আবশ্যক, অন্যদিকে তাহার শাখা প্রশাখার প্রান্তভাগও ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। শাখার প্রান্তভাগ ছাঁটিয়া দেওয়াকে (Cropping বা topping) কহে। এইরূপে শাখা প্রশাখার প্রান্তভাগ ছাঁটিয়া দিলে গাছের অনবরত বৃদ্ধিগতি ফল প্রসবনী শক্তিতে মিশিয়া সেই শক্তির গতি বৃদ্ধি করে। সুতরাং ফল ভাল ও অধিক হয়। শাখা প্রশাখা নির্গত করিবার জন্য যে সমুদায় শাখা কাটা যায়, তাহাদিগকে এমন ভাবে কাটিতে হইবে যেন, কাটিবার সময় সমুদায় বৃক্ষ শরীরের একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আকার থাকে। ছাঁটিবার সময় এই আকার রক্ষা করিতে পারিলে তবে সেই সকল শাখা প্রশাখাও পুনরায় শাখা প্রশাখা ছাড়িয়া তদ্রূপ আকার ধারণ করে। শাখা-

গুলির এমন স্থানে কাটিতে হইবে যে, পরে যে শাখা জন্মিবে তাহা বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্দেশে বাহির হয়। বৃক্ষের যদি কোন একটী অদৃশ্যকর স্থান ফাঁক থাকে, তবে সে স্থানের দুই একটী শাখাকে এমন করিয়া কাটিবে যে, তথা হইতে শাখা প্রশাখা জন্মিয়া সেই শূন্য স্থানটীকে পূর্ণ করে। যদি তথায় কোন শাখা কাটিবার উপযোগী না থাকে, তাহা হইলে সেই শূন্য স্থানের সন্নিকটস্থিত কোন দুই একটী শাখাকে টানিয়া সেই খানে বাঁধিয়া রাখিলে, সেই শাখা হইতে পরে শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে।

গাছপালার আকার, বৃদ্ধি ও স্বভাব বুঝিয়া প্রত্যেককে ছাঁটিবার নিমিত্ত সতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। রুগ্ন গাছকে অধিক পরিমাণে ছাঁটিতে হয়, পুরাতন শাখা প্রশাখার অর্দ্ধ পরিপক্ক স্থান পর্য্যন্ত রাখিয়া কাটিয়া দিতে হয়। আবার বৃক্ষ ও লতা সম্বন্ধে এই একই নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাল, স্থপারি নারিকেল প্রভৃতি শাখা হীন জাতীয় গাছের পুরাতন ও শুষ্ক পাতা কাটিয়া গাছের মস্তকটী উত্তমরূপে পরিস্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই সকল গাছের মস্তক পরিস্কার না থাকিলে, চিল, কাক ও পক্ষীতে উহাতে বাসা করে এবং নানা স্থান হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া গাছের মাথা অপরিস্কার করে এবং তন্নিবন্ধন গাছে পোকা মাকড় জন্মিয়া থাকে।

শাখা প্রশাখা যে ছাঁটিতে হয় তাহার ও একটী নিয়ম আছে।

প্রত্যেক শাখাদির অর্দ্ধ-পরিপক্ক স্থানে কাটিতে হইবে। যদি নূতন শাখা থাকে, তাহা আদৌ না কাটিয়া বরং উহাকে নিম্নদিকে ঈষৎ হেলাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ছাঁটিবার উদ্দেশ্য সফল হয়। গাছ পালার আকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, চারা অবস্থা হইতেই গাছকে যথানিয়মে পরিচালন করিতে হয়।

আকার নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্গে ফলনের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছের মধ্যদেশ অতিশয় ঘন বা অন্ধকার বিশিষ্ট হইলে তাহাতে অতি অল্প ফল হয়, এবং যাহা কিছু হয়। তাহাও বহির্দ্দেশে কিন্তু গাছের ভিতর ফাঁক থাকিলে ও তম্মধ্যে সহজভাবে বায়ু সঞ্চালন করিতে পারিলে এবং সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ পাইলে ফল অধিক জন্মে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৃক্ষের ফল মূল-কাণ্ড অপেক্ষা শাখা প্রশাখায় অধিক ফলিয়া থাকে। একারণে মূল কাণ্ডটীকে অধিক বাড়িতে না দিয়া শাখাদির বৃদ্ধির দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়।

আম্র। *

আম্র যে কেবল বাঙ্গালা দেশেই জন্মিয়া থাকে তাহা নহে। শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা জন্মে। ভারত-মহাসাগরস্থিত সিংহল, ও যবদ্বীপ, এবং চীন ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অনেক দেশে আম্র জন্মিয়া থাকে।

কথিত আছে যে, হনুমান যখন সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কায়—আধুনিক সিংহলে—গমন করেন, তখন তথাকার সুমিষ্ট আম্রফল ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ভারতে নিক্ষেপ করায় এদেশে আম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এ কথার উল্লেখ থাকিলেও সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের কথায় নির্ভর করিলে, রামায়ণের পূর্ব্বে ভারতে আম্র ছিল না, বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু বেদে আম্রের উল্লেখ থাকায় আমরা বলিতে পারি যে, রামায়ণের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভারতে আম্রগাছ জন্মিত। বেদ, রামায়ণ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থ; সুতরাং তাহাতে যখন আম্রের উল্লেখ দেখা যায়, তখন বৈদিক সময়েও যে ভারতে আম্র ছিল

---

*মল্লিখিত এই বিবরটীর কিয়দংশ বর্ত্তমান সালের ২রা আষাঢ় তারিখের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হয়।

এবং আর্য্য ঋষিগণ যে তাহা জানিতেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব আম্রের জন্য ভারতবর্ষ লঙ্কার নিকট ঋণী নহে।

ভারতের নানাস্থানে আম্র জন্মে, কিন্তু তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই, মহীসুরে এবং বাঙ্গালার মধ্যে মালদহ ও মুরসিদাবাদে যে সমুদায় আম্র জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট। মুরসিদাবাদে যে নানরূপ উৎকৃষ্ট আম্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তাহা অপর সাধারণে অবগত নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐ স্থানের আম্রগাছ স্থানান্তরে সহজে যাইতে পারে না। বাগিচা সম্বন্ধে ইংরাজি অথবা বাঙ্গালা ভাষায় যে সমুদায় পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন খানিতেই মুরসিদাবাদের আম্রের বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই জন্য সাধারণেও তাহার বিষয় জানেন না। "চুনখালির আঁব" নামে যে আম্র কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে চালান হয়, তাহা খাস মুরসিদাবাদের আম্র বটে, কিন্তু তাদৃশ ভাল জাতীয় নহে। তাহার কারণ এই যে, স্থানীয় ধনী ও ভদ্রলোকদিগের যে সমুদায় বাগান আছে, তাহার অপকৃষ্ট জাতীয় আম্র গুলিই কলিকাতার ফল-ব্যবসায়ীগণ খরিদ করিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। বাগান মধ্যে ভাল ও নামজাদা গাছে যে আম্র থাকে, তাহা উদ্যানস্বামীগণ বিক্রয় না করিয়া স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য রাখিয়া থাকেন। মালদহ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের অনেক উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র আজ কাল অনেক স্থানে দেখা যায় এবং গাছ-ব্যবসায়ীগণও বিক্রয় করিয়া থাকেন; কিন্তু মুরসিদাবাদের শতাধিক উৎকৃষ্টজাতীয় আম্র মুরসিদাবাদেই অবরুদ্ধ আছে।

মুরসিদাবাদ নওয়াবের দেশ, এবং বাগ্ বাগিচা প্রায় সমুদায়ই নওয়াবদিগের; সুতরাং তথাকার গাছ অন্যস্থানে যাইতে পায় না। মুরসিদাবাদবাসীগণ যদিও স্থানীয় আম্রকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তথায় উহার যথাবিধি পা'ট হয় না, এবং দেখা যায়, সকল গাছের সঠিক নাম নাই। একই গাছ অন্য বাগানে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা উদ্যানস্বামীগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক না করিয়া থাকিলেও, নামের প্রতি ঔদাসীন্য যে তাহার কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আশার বিষয় এই যে, অনেক স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক আজ কাল নানা প্রকার স্থানীয় আম্রের একত্র আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মুরসিদাবাদে অবস্থান কালে রেইসবাগে স্থানীয় আম্রের 'একজাই' করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক উৎকৃষ্টজাতীয় আম্রের গাছও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মদীয় বন্ধু বাবু মহেশ নারায়ণ রায় তথাকার নানাবিধ উৎকৃষ্ট আম্রের গাছ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় বাগানে রোপণ করিয়া কেবল যে নিজের উদ্যানকে মূল্যবান করিয়াছেন তাহা নহে,—তদ্দারা তিনি মুরসিদাবাদেরও একটী স্থায়ী উপকার করিয়াছেন। সাম্রেক সংগ্রহের মধ্যে নিজামতের 'হুমাউন-মঞ্জিল' ও 'রাজাসাহেবের বাগান' * এবং কাটরাস্থিত রায় লছমীপত সিং বাহাদুরের বাগানকে উৎকৃষ্ট বলা যায়।

† কলিকাতায় যোড়াবাজারের রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব বাহাদুর পূর্ব্বে নিজামৎ-সরকারের দেওয়ান ছিলেন। সচরাচর লোকে তাঁহাকে রাজা সাহেব

মুরসিদাবাদের মধ্যে যে সকল আম্র আছে, তন্মধ্যে কালা-পাহাড়, কহিতুর, রো'খি, বিম্লী নাজিম পছন্দ, মিছ্রিকন্দ, লম্বা-ভাড়ড়ে, তোতা (হরিগঞ্জের), আনানাস, এনায়েত-পছন্দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর আম্র। একাল পর্য্যন্ত যে সকল আম্র তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরো অনেক আম্র আছে, যাহাদের যথাবিধি পা'ট হইলে উন্নত হইতে পারে এবং যত্ন করিলে রকমের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

মুরসিদাবাদে ও মালদহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্রের বাগান আছে এবং প্রতি বৎসর এই দুই স্থানে যে আম্র জন্মায়, তাহার অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া দেশান্তরে চালান হয়। এক মুরসিদা-বাদেই বোধ হয় লক্ষ টাকার আম্র প্রতি বৎসর বিক্রয় হয় এবং তাহা 'চুনাখালির আঁব' নামে বাজারে প্রচলিত*।

বীজ, জোড়-কলম ও গুটি-কলমে আম্রের চারা হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস মধ্যে যে কোন সময়ে অল্প ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোরে বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজকে আঁটিও বলিয়া থাকে। সুপক্ক ফলের আঁটি না হইলে ভাল চারা হয় না। হাপোরের মাটি হাল্‌কা ও সার মিশ্রিত করিয়া লইয়া দুই ইঞ্চ মাটির মধ্যে আঁটি পুতিয়া দিতে হইবেক। বীজে জলের অভাব না হয়, এজন্য হাপোরে সর্ব্বদা জল দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু বর্ষাকালে

বলিত। এই বাগান তাঁহারই ছিল এজন্য উহাকে রাজা সাহেবের বাগান কহে।

জল দিবার আবশ্যক হয় না। কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারাগুলি দুই তিন মাসের হইলে স্থানান্তর করিতে হয় এবং যাবৎ তাহাদিগকে ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে না বসান' যায়, তাবৎ যথানিয়মে পালন করিতে হইবে। চারাগুলি দুই বৎসরের না হইলে জমীতে স্থায়ীরূপে বসান' কোন মতে উচিত নহে।

হাপোর হইতে চারাকে স্থানান্তর করিবার কালে উহাকে 'খাসি' করিয়া দিলে গাছের আকার লম্বা না হইয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে। চারার মূল-শিকড়কে কাটিয়া দেওয়াকে 'খাসি' করা কহে। লম্বা গাছ অপেক্ষা বিস্তৃতায়তনবিশিষ্ট গাছে অধিক ফল হয়, এই জন্য গাছকে শেষোক্ত প্রকারের আয়তন বিশিষ্ট করিতে হইলে চারাকে 'খাসি' করিয়া দিতে হয়। 'খাসি' করিবার কার্য্য অতি সূক্ষ্ম, এজন্য কৃতি মালী ভিন্ন অনভিজ্ঞ বা শিক্ষানবিশের দ্বারা এই কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হওয়া আশঙ্কার কথা।

জোড়-কলমের প্রণালী অতি সহজ হইলেও, সকলে কিন্তু সুচারুরূপে কলম বাঁধিতে পারে না। চারা ও গাছের শাখা ঈষৎ কাটিয়া বা চাঁচিয়া দুইটী বাঁধিয়া দিলেই জোড় কলমের কার্য্য সম্পন্ন হইল সত্য; কিন্তু ইহার মধ্যে যে নিয়মগুলি আছে, তাহা জানা না থাকায় অধিকাংশ সময়েই উহাতে নানাবিধ ব্যাঘাত ঘটে এবং সেই কাটা স্থান জুড়িয়া গেলেও, তাহার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। যাহা হউক, জোড়-কলম

বাঁধিবার প্রকৃষ্ট ও গূঢ় নিয়মাবলী স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আম্রের জোড়-কলম বাঁধিলে চারা ও শাখায় জোড় লাগিতে অনেক বিলম্ব হয় না। পূরা বর্ষা থাকিলে এবং চারা ও শাখা কোমল থাকিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে জোড় লাগে; কিন্তু বর্ষার অভাব হইলে জোড়ের স্থানের রস শুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং জোড় লাগিতে বিলম্ব হয়। এতদ্ব্যতীত শাখা ও চারা যত স্থূল হয়, সেই অনুসারে জোড় লাগিতেও বিলম্ব হয়। চারা ও শাখার বয়ক্রম এক বৎসর হইলে আম্রের জোড়কলম বাঁধিবার সুবিধা হয়।

গুল বা গুটী দ্বারা আম্রের কলম উৎপন্ন করিতে হইলে আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মধ্যে বাঁধিতে হয়। একেইত গুটী দ্বারা আমের কলম সহজে জন্মে না, তাহাতে যদি বর্ষার অভাব হয় কিম্বা উহার শিকড় বাহির হইবার পূর্ব্বেই বর্ষা অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে গুটিতে কলম নামে না। এই সকল কারণে এবং সকল আম্রের গুটিতে কলম উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহার গুল-কলমের প্রথা প্রচলিত নাই।

গুলেই হউক বা জোড়েই হউক, কলম গাছ হইতে কাটিয়া কিছু দিবস হাপোরে পুতিয়া রাখিতে হয়। যদি টবে কলম তৈয়ার হইয়া থাকে, তবে কলমটীকে গাছ হইতে কাটিয়া লইয়া কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে কিছুদিন রাখিতে হইবে। এরূপ করিলে ছেদিত কলমের যে কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা দূর হয়।

আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত মাঠে চারা বা কলম পুতিবার সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় মাটি যখন কর্দ্দমবৎ হইয়া থাকে, তখন মাটিতে গাছ রোপণ না করিয়া, মাটিতে "জো" হইলে যথানিয়মে পুতিতে হইবে। যে স্থানে স্থায়ীরূপে গাছ পুতিতে হইবে, গাছ পুতিবার অন্ততঃ ১০।১২ দিবস পূর্ব্বে সেই স্থানে গর্ত্ত কাটিয়া রাখিতে হইবে। গাছ বসাইবার কালে মাটি চূর্ণ করিয়া ও তাহার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া উহার গর্ত্ত পূরণ করিতে হয়। গর্ত্তের মধ্যে হাড় বা মাটির সহিত অস্থি চূর্ণ মিশাইয়া দিলে চারা গাছের উপকার দর্শে এবং সেই অস্থি অনেক দিবস পর্য্যন্ত বৃক্ষ শরীর পোষণ করে। ক্ষেত্রে ঝাড় হইতে ত্রিশ হাত ব্যবধানে একটী চারা পুতিতে হইবে। স্থানের অভাব হইলে গাছ উর্দ্ধদিকে লম্বা হইয়া যায় এবং রুগ্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

বীজোৎপন্ন চারা পুতিবার কালে উহার কাণ্ড মৃত্তিকা মধ্যে না পুতিয়া কেবলমাত্র কাণ্ড ও শিকড়ের সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত পুতিতে হইবে; বরং কাণ্ডের অল্পাংশ মৃত্তিকা মধ্যে থাকিলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু শিকড়ের সামান্য অংশও মৃত্তিকার উপরে না থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জোড়-কলমের সংযুক্ত স্থানটী অবধি পুতিয়া দিতে হয়।

ক্ষেত্রে চারা পুতিয়া তাহার পার্শ্বে একটী কলার 'তেউড়' বা ছোট গাছ পুতিয়া দিলে, কলা গাছের রসে মাটি সর্ব্বদা রসিয়া থাকে এবং কলা গাছের পাতা দ্বারা নূতন চারা গাছ রৌদ্র

হইতে আচ্ছাদন পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু সাবধান যেন, কলাগাছ ঝাড় বাঁধিয়া চারা গাছকে না একবারে ঘেরিয়া ফেলে। গাছ গুলি ৩।৪ বৎসরের হইলে কলাগাছ গুলিকে একবারে তথা হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে।

ফসলের সময়ানুসারে আম্রের গাছ গুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এক এক শ্রেণীর গাছ এক একটি সতন্ত্র তক্তায় রোপণ করিতে হয়। সকল আম্র গাছই এক সময়ে ফল ধারণ করে না বা এক সময়ে ফল পাকিয়া উঠে না। কোন জাতি বৈশাখে, কোন জাতি জ্যৈষ্ঠে, কোন জাতি আষাঢ়ে, কোন জাতি শ্রাবণে, আবার কোন জাতি ভাদ্রে পাকিয়া থাকে। বৈশাখ মাসে যে সমুদয় আম্র পাকিয়া উঠে, তাহাদিগকে এক শ্রেণী, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল আম্র পাকিয়া উঠে তাহাদিগকে এক শ্রেণী, এইরূপে যে যে আম যে যে মাসে পাকিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই জানিয়া, তাহাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করিয়া রোপণ করিলে, এক সময়েই সকল জাতীয় গাছের পাট করিতে হয় না। জাতি নির্ব্বিশেষে সকলগুলির এক সময়ে সমান পাট করিলে, যে জাতির সময় উপস্থিত তাহার উপকার হয়, কিন্তু অপর জাতির তাহাতে অনিষ্ট হয়। বৈশাখী আম্রের সহিত ফজলী, ল্যাঙড়া বা ভাদুড়ে আম্রের গাছ রোপণ করিলে, বৈশাখী আম্রের পাটের সঙ্গে শেষোক্তদিগেরও পাট হয়। বৈশাখী আম্রের গোড়া যে সময়ে খুঁড়িয়া দেওয়া বা তাহাতে জল

সেচন করা আবশ্যক, সে সময় শেষোক্ত বা অন্ত 'নামি' জাতীয় আম্রের সেই পাট করিলে গাছ অসময়ে ফলবতী হইতে পারে, অথবা মুকুলিত না হইয়া তাহার পাতা ও শাখা প্রশাখা বাহির হইতে পারে। এই সকল কারণে বিবেচনা পূর্ব্বক গাছকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া রোপণ করিতে হইবে। আর এক কথা, ক্ষেত্রের পূর্ব্বাংশে প্রথমে জল্‌দী তৎপরে তৎপরবর্ত্তী এবং শেষ দিকে অর্থাৎ পশ্চিমাংশে নাম্‌লা জাতীয় গাছ রোপণ করিলে সকল জাতিরই সাময়িক পাট হইবার সুবিধা হয়।

বীজোৎপন্ন গাছের ৫।৬ বৎসরে এবং কলমের গাছে তিন বৎসরে ফল ধরে। ইহার পূর্ব্বে যদি গাছে মুকুল আইসে, তাহা হইলে সেই মুকুল নষ্ট করিয়া দিলে ভাল হয়। তাহার কারণ এই যে, নিতান্ত চারা গাছে ফল ধরিতে দিলে, গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে আম্রগাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং সেই অবস্থায় দুই সপ্তাহ রাখিয়া তৎপরে উহাতে নূতন মাটি বা সার দিতে হইবে। গাছে মুকুল আসিলে, গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করা আবশ্যক, মাটি নিস্তেজ ও সার হীন হইলে অথবা মাটি রস হীন হইলে মুকুল ও ফল্ ঝরিয়া যায়। গাছের তলায় জঙ্গল জন্মিলে, গাছ রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং অতিশয় কম ফল ধরে। ইহাতে ফলের আস্বাদনও খারাপ হইয়া যায়। এজন্য মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের তলায় লাঙ্গল

দিলে মাটি আল্‌গা হয়, সুতরাং বর্ষাতে অধিক জল শোষণ করিতে পারে কিন্তু মাটি কঠিন হইলে, বর্ষার জল জমিয়া গাছের সমূহ অনিষ্ট সাধন করে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় আল বাঁধিয়া দিলে তলার মাটি অনেক দিবস সরস থাকে এবং বৃক্ষগণও ধীরে ধীরে সেই রস আহরণ করিয়া সতেজ হইয়া থাকে।

আম্র পাকিতে আরম্ভ হইলে তাহা প্রতিদিন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং গৃহ মধ্যে মাচা বা তক্তায় রাখিয়া সুপক্ক করিতে হইবে। গাছ হইতে আম্র পাড়িবার জন্য 'জাল্‌তি' বা ঠুসি ব্যবহার করা ভাল। বিনা 'জাল্‌তিতে ফল পাড়িলে উহা মাটিতে পড়িয়া ছেঁচিয়া যায় এবং তাহাতে আম্রের আস্বাদন খারাপ হয়। গাছ হইতে আম্র সদ্য পাড়িয়া খাইলে তাদৃশ সুমিষ্ট লাগে না, বরং তাহাতে আটার গন্ধ বাহির হয়। সুপক্ক হইলেও অন্ততঃ ৯।১০ ঘণ্টা গৃহে না রাখিয়া খাওয়া উচিত নহে। আম্র খাওয়া হইবার পরে, উহার আঁটি ফেলিয়া না দিয়া, চারা উৎপন্ন করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত।

আম্র গাছের নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গাছের শাখা প্রশাখায় যে গাঁট জন্মে, তাহাতে যে কেবল রোগগ্রস্ত গাছেরই ক্ষতি হয় তাহা নহে,-সন্নিকটস্থ গাছ সকলও পরে সেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই গাঁট ছোট ছোট, ভাঁটার আকার হইতে বৃহদাকার ধামার ন্যায় পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ

ছোট ভাঁটা বা গাঁটি গাছে দেখা গেলে, সত্বরেই যদি তাহার কোন প্রতীকার করা না যায়, তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যেই ঐরূপ গাঁট গাছের অন্যান্য স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে অপর গাছেও সেই রোগ জন্মে। উক্ত রোগের লক্ষণ এই যে, গাঁটের উপরিভাগ ফাটা হয় এবং হঠাৎ দেখিতে মানুষের এলো-মেলো-চুল বিশিষ্ট মস্তকের ন্যায় দেখা যায়। উহার অভ্যন্তর হইতে আটা বাহির হইতে থাকে। অনেক স্থানের অনেক আম্রের গাছে ইহা দেখা যায়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে উদ্যানস্বামীগণ তাহার কোন প্রতীকার করেন না। ইহাতে গাছের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, গাছ দুর্ব্বল হয় এবং ফলও নিকৃষ্ট হয়। এই রোগ আম গাছ ব্যতীত অপর কোন গাছে জন্মে না। মুরসিদাবাদের মদীয় জনৈক বন্ধু মুন্সি হবিবর রহমন সাহেব কয়েকটী বড় বড় গাঁট গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন। অস্ত্র সাহায্যে সেই সকল গাঁট চিরিয়া দেখা গেল যে, উহার অভ্যন্তর ঘায়ের ন্যায় লাল এবং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, উহা কীটের কার্য্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন উহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছে গাঁটি জন্মিলে, অচিরে তাহার প্রতিবিধান করা উচিত কিন্তু কিরূপে তাহা করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। প্রথমতঃ কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গাঁটি গুলিকে এরূপভাবে কাটিতে হইবে যে, তাহার সামান্য অংশও গাছে না থাকে এবং যতদূর পর্য্যন্ত উহার অভ্যন্তরস্থিত সেই লাল বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইবে, ততদূর উত্তমরূপে

কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তদনন্তর, দুই চারি দিন ঐ ক্ষত স্থানটী গরম জল দিয়া ধৌত করা আবশ্যক। গরম জলের সহিত সাবান মিশ্রিত করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

ফলে দুই জাতীয় পোকা জন্মে,—এক জাতীয় কৃমিবৎ ও অন্য জাতীয় পাখা বিশিষ্ট। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে উভয় প্রকারের এবং কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি স্থানে শেষোক্ত প্রকারের কীট জন্মে। কৃমিবৎ পোকা আম্র মধ্যে কোথা হইতে জন্মে, তাহা ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারেন না, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে ফলও পোকাবিশিষ্ট হয়। এজন্য তাঁহারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেন। গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে ফলে পোকা ধরে, একথা প্রথমতঃ অসঙ্গত বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক যে, গাছ নীরোগ হইলে ফলও নীরোগ হয়। দ্বিতীয় প্রকার যে পোকার কথা বলা গিয়াছে, তাহা বাহির হইতে ফলে প্রবেশ করে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ফলের গাত্রে কোন ছিদ্র নাই, অথচ ভিতরে পোকা আছে। এই পোকা বারমাসই থাকে। বাগানের মধ্যে যে স্থানে জঞ্জাল বা ইষ্টকের কাঁড়ি থাকে, উহারা তাহারই মধ্যে বাস করে এবং আম্রগাছে মুকুল আসিলে ফুলের কোরকে প্রবেশ করে। ফুল গর্ভবতী হইলে সেই পোকা আর বাহিরে আসিতে না পারিয়া তাহারই মধ্যে বাস করে এবং ফল যত বাড়িতে থাকে, সেই কীট তত

পরিপুষ্টি লাভ করে ও ফলের ভিতরে ডিম্ব প্রসব করিয়া স্বীয় জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই জাতীয় পোকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ উদ্যান মধ্যে কোন স্থানে জঞ্জাল বা রাবিস থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়ত, গাছে যখন মুকুল হয়, তখন হইতে বাগানের মধ্যে গাছের তলায় স্থানে স্থানে আগুন ও গন্ধক জ্বালাইয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ কোন প্রকৃষ্ট উপায় দেখা যায় না।

মুরসিদাবাদের বিশেষ বিশেষ আম্রের তালিকা।

অমৃতভোগ।
অনুপান বা অনুপম।
অপ্সরা (নগিনাবাগ)।
আলি-পসন্দ।
আলিবক্স।
আতা-পসন্দ।
আনানাস নং ১।
ঐ ... নং ২।
আফিঙ্গি।
আষাঢ়িয়া।
আমীর-পসন্দ।
আসমানতারা।

আমরুদ।

আনারদানা।

আশুনা-বাহার (অশিনা-বাহার)।

ইমামকন্দ।

উমদা-খাসা।

এনায়েত পসন্দ।

এলা'চ দানা।

কালাপাহাড়।

কাকাতুয়া।

কহিতুর।

কাটগুলিয়া।

কালুয়া।

কাকচিয়া (মহেন্দ্রবাবুর বাগানের)

কয়ঞ্জা।

করকরিয়া।

কালমেঘা।

কুদ্রক-খাম্বা।

কাঞ্চনকম্বা।

খীসাপাতী (সাদেক বাগের)

খরমুজা।

খাজা।

খানম-পসন্দ।

গুলকন্দ।

গৌরজিৎ।

গোলাব-জামন।

গয়রামর্দ্দন।

গোরিয়া

গোলাবী।

গঙ্গাপ্রসাদ।

চাপ্টি।

চাকুখাসা।

চরকীচাঁপা।

চুসনী।

চাম্পা (চুনাখালির)।

টিয়াকাটা।

তোতা, বড়, (হারিগঞ্জের)।

ঐ ছোট, (রৈইসবাগের)।

তালাবি।

তোতামুখী।

তুন্দখাসা।

তরবুজা।

তরু-প্রসন্দ।

দাউদ-ভোগ।

নাজুক-বদন।

নাজিম-পসন্দ।

নওনেহাল (চুনাখালির)।

নওয়াব-পসন্দ।

পলখলিয়া।

পিয়ারাফুলি।

পান্না-পসন্দ।

পিপড়ে খাগা (লালকুটি)

পোঁপিয়া।

পাতা।

ফয়কল বয়ান। *

ফারদৌব-পসন্দ।

বঙ্গজান।

বাদসা-পসন্দ।

বারমেসে।

বাতাসা।

বাতাবী।

বেলা।

বন্ধু-পসন্দ।

বৃন্দাবনী।

বেগম-পসন্দ।

বিমলী।

* ইহাকে খোদাবক্স ও কহে।

ভবানী-চৌরস।

মিয়া-পসন্দ (রৈইসবাগ্)।

মতিয়া।

বর্ত্তমান।

মজলিস্-রওসন্।

মো-সাহেব।

মোলাম জাম।

মোহনভোগ। (লালকুটি)

মিঠি।

মালি-পসন্দ।

মিছরিকন্দ (রইসবাগ)।

মধুবিলাস।

মান্দ্রাজী।

ময়লা।

মনিয়া-খাসা।

মৌলসরি।

মিরজা-পসন্দ।

রো'য়ী।

রাণী-পসন্দ।

রাহুপেটী।

রামতনু খাসা।

রৈইস-পসন্দ। (রৈইসবাগ্)

রতনকেওয়া।

রামগতি-থাসা।

লাড়ুয়া।

শ্রাবণে।

শিপিয়া।

শিরাদার।

শরদা।

সাগা।

সাদেক-পসন্দ।

সিন্দুরিয়া।

সারেঙ্গা।

সব্জা।

সাপ্তালু।

সোর সাহেবের বোম্বাই (Mr. Shower's Bombay)

সা-দোলা।

সরবতী।

সুলতান-পসন্দ।

সা-তুঁত।

স্বা'সিয়া।

সোয়াইয়া।

হীরালাল-বোম্বাই।

হোসেন-বক্স্।

হোভিজে কস্‌র (বৈইসবাগ্)

হালুয়া ফুলচুল্।

মহীসুরের আম্র। †

বানি কৈ।

গোল কেণী।

মঞ্জমাড়ু।

চিং কৈ।

চিত্তুব।

জিনি মতি বা জিনি মাড়ু।

পিচ কৈ।

বাদামী।

শক্কানী বা নীনাড়ু।

পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার (GOA) আম্র।

কোলেকা।

কষ্টা।

টিমাব বা টাইমেরাটা।

ডিক্রোয়াড।

মুন্সী মজফর খাঁ হোসেনের বাটী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক এই গাছ বৈইস বাগে আনীত হয়।

† Gazateer of Mysoreand Coorg by Lewis Rice.

ফাওর্গাণ্ডিনা।

ফ্রেড্রিকো।

সাধারণের অবগতির জন্য মুরসিদাবাদের কয়েকটী উৎকৃষ্ট আম্রের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

আলিবকস্। এই আম্র অতি বিরল। মুরসিদাবাদে আলিবকস নামক একব্যক্তি ছিলেন, তাহার বাগানে এই গাছ ছিল এবং তাহারই নামে উহা খ্যাত। এক্ষণে উক্ত বাগান মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত নওয়াব বাহাদুরের ষ্টেটভুক্ত হইয়াছে। এই আম্রের আকার প্রায় গোল এবং ওজনে দেড় পোয়া হইতে আধ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফল আঁশ-শূন্য ও রসাল। আস্বাদন অম্লমধুর, এইজন্য নওয়াবদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত আদরণীয়। গাছ-পাকা আম ৮।১০ দিন ঘরে রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। এই আম আষাঢ় মাসে পাকিতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে এই জন্য ইহা বিশেষ দরে বিক্রীত হয়। শতকরা ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত ইহার দর।

কহিতুর। ইহা আঁটির গাছ। শ্রীযুক্ত নওয়াব বাহাদুরের মধ্যম ভ্রাতা নওয়াব হোসেন আলি মির্জা,-ওরফে মাজ্‌লা সাহেব,-বাহাদুরের বাগানে এই আম্রের উৎপত্তি। পূর্ব্বে এই গাছ জনৈক ইউনানী-চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হাকিম আগা মহম্মদ

সাহেবের ছিল। মুরসিদাবাদ সহরে উক্ত মাজ্লা-সাহেবের ন্যায় আম্র আস্বাদনকারী আর কেহ নাই বলিয়া খ্যাত। হাকিম-সাহেব কোনও সময়ে এই আম্র সহিত উঁহাকে একখানি ডালি উপঢৌকন্ প্রেরণ করেন। অন্যান্য আম্রের মধ্যে নওয়াব-সাহেব 'কহিতুর' আম্রকেই উৎকৃষ্ট বলেন এবং তদনুসারে তিনি হাকিম-সাহেবের নিকট হইতে উক্ত গাছটী ২০০০্ দুই হাজার টাকা দিয়া খরিদ করিয়া লয়েন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই আম্র গাছ কালা-পাহাড় আম্র ফলের আঁটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু কহিতুরের আকার, আস্বাদন ও অন্যান্য অবস্থা দৃষ্টে ইহাকে কালা-পাহাড় হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কহিতুরের আকার লম্বা এবং ওজনে আধসের হইতে তিন-পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। লেখনী দ্বারা এই আম্রের গুণ বর্ণনা করা কতক পরিমাণে অসাধ্য। মুর্সিদাবাদ মধ্যে প্রায় ১৫০ রকমের উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র আছে, তন্মধ্যে ২০।২৫ রকম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ২০।২৫ রকমের মধ্যে 'কহিতুর, সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাজারে এই আম্র পাওয়া যায় না, এজন্য ইহার দর নাই। ৺রায় লচ্মীপৎ সিংহ বাহাদুর বিপুল চেষ্টা করিয়া হাকিম-সাহেবের নিকট হইতে একটী আম্র লইয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে রায়বাহাদুর মূল্য স্বরূপ তাঁহাকে পাঁচটী টাকা দিতে চাহেন, কিন্তু হাকিম সাহেব উক্ত আম্রের বিনিময়ে পাঁচটী টাকা অনুপযুক্ত বিবেচনায় গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, পাকা-আম্র ৩।৪ দিন ঘরে জাগ্

দিয়া রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। এই আম্র কতক পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিতে পারে অর্থাৎ নাড়া-চাড়াতে সহজে ইহার স্বাদের বৈলক্ষণ্য হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ইহা পাকিতে আরম্ভ হয় এবং আষাঢ় মাসের কিছু দিন পর্য্যন্ত থাকে।

কালা-পাহাড়। এই আম্র অন্য কোন স্থান হইতে যে আনিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। মৃত নওয়াব-নাজীর সিদি দরাবালি খাঁ বাহাদুরের বাগানে আসল আঁটির গাছ অদ্যাপি আছে। উক্ত গাছ হইতে অন্যান্য নওয়াবদিগের এবং ২।১টা গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাগানে কলম জন্মিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, 'মৃজাপসন্দ' আম্রের আঁটি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। মুরসিদাবাদের কালা-পাহাড়ের সঙ্গে বাজারে কালা-পাহাড়ের অনেক বিভিন্নতা আছে। প্রথমোক্ত স্থানের কালা-পাহাড় গাছের পাতা সরু ও লম্বা এবং শাখা প্রশাখা কৃষ্ণাভাযুক্ত। ফলের আকার প্রায় গোল কিন্তু নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ লম্বাকৃতি। ওজন প্রায় আধসের। ফলের খোসা বা ছাল অত্যন্ত পাত্‌লা,—আস্বাদন অপরিমিত মিষ্ট ও রসাল। ফল কাটিবার-কালে রস গড়াইয়া যায়। বেরেসা বা আঁশ-শূন্য এবং আঁটি অতিশয় ছোট। আম্র পাকিলে তাহার উপরিভাগের বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না, এজন্য ফল সুপক্ক ও খাইবার উপযোগী হইয়াছে কি না স্থির করা বড় কঠিন। কাঁচা অবস্থায় ইহা যেরূপ কোমল থাকে, পাকিলেও তাহার রূপান্তর হয়

না। কাঁচা আম্র গাছ হইতে পাড়িয়া ফলের অবস্থানুসারে তিন দিন হইতে ছয় দিন পর্যান্ত জাগে রাখিলে, কাল রঙ্গের উপরে কোন কোন স্থানে হরিদ্রাবর্ণের ঈষৎ আভা দেখা যায়, এবং সেই সময়েই ইহা খাইবার উপযোগী হয়। এই অবস্থার পূর্ব্বে ইহাকে কাটিয়া খাইলে অতিশয় অম্লাক্ত বোধ হইবে এবং অজ্ঞানিত ব্যক্তি ইহাকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর আম বলিয়া ঘৃণা করিবেন। আবার ঠিক পাকা অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইহার আস্বাদন পান্‌সে ও ঝাল বোধ হইবে। পল অনুপল গণনা করিয়া যেমন সন্ধি-পূজার বলিদানের সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়, 'কালাপাহাড়' আম্র খাইবার পক্ষেও তাহাই, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ঠিক লগ্নমত ইহাকে সুপক্কাবস্থায় খাইতে পারিলে তবে ইহার গুণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বাজারে এই আম্র খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাসের শেষ অবধি থাকে।

খরমুজা। এই আম্রের গাছ খাস চুণাখালিতে আছে। আদি গাছটী আঁটির, এবং তাহা উক্ত মহালের জমিদারের দখলে আছে। নওয়াবদিগের মধ্যে একজন কেহ এই গাছটীর সত্ব খরিদ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই গাছ হইতে কলম অন্যান্য কোন কোন বাগানে গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল গাছের ফল মূলগাছের ন্যায় হয় নাই। এই আম্রের আকার প্রায় গোল এবং ওজনে প্রায় দেড়-পোয়া হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের

মধ্যে গণ্য, সুতরাং উৎকৃষ্ট আম্রের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তৎসমুদায়ই ইহাতে পাওয়া যায়, অধিকন্তু ইহাতে খরমুজার সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম খরমুজা হইয়াছে। এই আম্র নওয়াবদিগের বিশেষ আদরের জিনিষ। চুণাখালির আসল গাছের আম্র প্রতি বৎসর বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন কোন বৎসর এই গাছের ফলকর ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকায় বিক্রয় হয় এবং সেই আম্র বাজারে শতকরা ৫।৬৲ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পাকিয়া ফুরাইয়া যায়, তবে কখন কখনও আষাঢ় মাসের ৮।১০ দিন পর্য্যন্তও থাকে। এই আম্র 'জাগে' ৩.৪ দিন থাকিলে খাইবার উপযোগী হয়। ইহা কতক পরিমাণে কষ্ট সহিষ্ণু।

খানম্-পসন্দ। মুরসিদাবাদে কোন সময়ে ও কোন স্থান হইতে এই আম্র গাছ আনিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই গাছটী কলমের এবং ইহা নিজামৎ-ষ্টেট-ভুক্ত 'ফৌজ-বাগ' নামক বাগানে আছে। ইহার কলম অন্য কোন বাগানে নাই এবং কাহারও পাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহার কলম কাহাকেও দেওয়া হয় না।

ক্ষীরসাপাত। বহুদিন পূর্ব্বে মালদহ হইতে মুরসিদাবাদে আইসে কিন্তু মুরসিদাবাদের মাটি ও আব-হাওয়া আম্র বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বিধায় একণে মালদহের ক্ষীরসাপাত হইতে মুরসিদাবাদের ক্ষীরসাপাত এক স্বতন্ত্র জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় সকল নওয়াবদিগের বাগানেই ইহা আছে

এবং চুণাখালিতেও অনেকগুলি গাছ আছে। এই আম্র ঈষৎ লম্বা ধরণের এবং নাক-বিশিষ্ট। ওজনে একপোয়া হইতে সাতছটাক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাকিলে বোঁটার দিকে মেটে হরিদ্রা বর্ণ হয়। ইহার গুণ কতক পরিমাণে অমৃতভোগ আম্রের ন্যায়। পাকা অবস্থায় অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, এবং খোসা কুঁকড় হইলেও পচিতে দেখা যায় না, সুতরাং দেশান্তরে প্রেরণ করিবার উপযোগী। গাছ পাকা আম্র ১৫।২০ দিন পর্য্যন্ত ঘরে রাখা চলিতে পারে এবং তাহাতে স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রথম শ্রেণীর আম্রের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমুদায়ই ইহাতে আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে উহা পাকিয়া শেষ হইয়া যায়। সচরাচর ৩৲ টাকা দরে পাওয়া যায় এবং যে বৎসর ফলন অধিক হয়, তখন ২৲ টাকাতেও পাওয়া যায়।

তোতা। দুই জাতীয়,—এক বড়, অপর ছোট। বড় জাতীয়কে 'হরিগঞ্জের তোতা' কহে। ইহার মূল গাছ-নওয়াব ইমসিসা বেগম সাহেবার হরিগঞ্জের বাগানে আছে। গাছটী আঁটী হইতে উৎপন্ন। অন্যান্য বাগানে যে তোতা আছে, তাহাপেক্ষা 'হরিগঞ্জের তোতা' উৎকৃষ্ট। এই আম্রের নাকটী ঠিক তোতাপাখীর ন্যায়, এই জন্য ইহাকে 'তোতা' কহে। আম্রের আকার লম্বা এবং ওজনে প্রায় আধসের হইবে। পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। খোসা খুব পাতলা, শাঁস বেরেসা, আঁটী ছোট এবং আস্বাদন খুব মিষ্ট। বৈশাখমাসের শেষভাগে পাকিতে আরম্ভ

হইয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ পর্যাস্ত থাকে। এই আম্র বিশিষ্ট পরিমাণে কষ্ট সহিষ্ণু। পাকা আম্র ২।৩ দিন জাগে রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়। শতকরা ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা দরে বিক্রয় হয়।

ছোট জাতীয় তোতাও প্রায় উহার ন্যায়। এই 'তোতা' রৈইসবাগে আছে।

দাউদ-ভোগ। এই আম্র মুরসিদাবাদের কোন আম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে এই আম্রের নাম শুনা যায় নাই, সুতরাং ইহা যে নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মৃত দাবাবালি খাঁ বাহাদুরের বাগানে দুইটী কলমের গাছ আছে এবং সেই গাছ হইতে আরও কয়েকটী বাগানে বিস্তৃত হইয়াছে। নওয়াবদিগের পুরাতন বাগানে ইহা নাই। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু জানা যায় নাই। এই আম্রের আকার লম্বা কিন্তু ছোট, ওজনে এক পোয়ার অধিক হয় না। রং হরিদ্রাবর্ণ, স্বাদ উপাদেয় এবং নির্দ্দোষ ও নাবি (Late) অর্থাৎ শ্রাবনমাস পর্য্যন্ত থাকে। শ্রাবন মাসে শতকরা ৮।১০ টাকা দামে বিক্রয় হয়। পাকা আম্র ২।৩ দিন 'জাগে' রাখিলে খাইবার উপযোগী হয়।

দুদিয়া বা দুধিয়া। মুরসিদাবাদে এই আম্রের অনেক প্রকার আছে, তাহার কারণ এই যে, যে গুণ থাকিলে দুধের সহিত ব্যবহার বা তুলনা করা যাইতে পারে, তাহা আম্রে

বলিয়া এই আম্র 'দুদিয়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। আঁশ-যুক্ত সুমিষ্ট আম্র দুগ্ধের উপযোগী, এজন্ত অনেকে এইরূপ আম্রকে 'দুদিয়া' কহেন। আবার কেহবা আম্রের ভিতর সাদা হওয়ায় তাহাকে দুধিয়া বলেন। এই সকল কারণে দুধিয়া অনেক প্রকারের দেখা যায়। শ্রীযুক্ত মাঙ্গলা সাহেবের মিঞা অম্বরের দরুন বাগানে যে 'দুধিয়া' আম্রের গাছ আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা দুধিয়া নাম ধারণ পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত, কারণ কাটিলে ইহার বর্ণ দুগ্ধের ন্যায়, আস্বাদন অতিশয় সুমিষ্ট, সুতরাং দুগ্ধে খাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী ও উপাদেয়। ইহার আকার ছোট এবং গোল, রং হরিদ্রাভ। জ্যৈষ্ঠমাস মাস মধ্যে পাকিয়া শেষ হইয়া যায়। শতকরা ৩৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নাজুক-বদন। নাজুক-বদন হিন্দি শব্দ। 'নাজুক' অর্থে কোমল (Delicate) বা লজ্জাশীল এবং বদন অর্থে শরীর। বস্তুতঃ উপযুক্ত আম্রকে উপযুক্ত নামই দেওয়া হইয়াছে। ইহা এতই কোমল যে, অঙ্গুলির ভর সহিতে অক্ষম। অসাবধানতা-বশতঃ আম্রটীকে একটুমাত্র টিপিয়া ধরিলে গাত্রে দাগ বসিয়া যায়, এজন্ত ইহাকে আলগাভাবে ধরিতে হয়। ঠুসিতে বা জালতিতে একটী আম্র পাড়িয়া আর একটী আম্র পাড়িলে পরস্পরে সামান্য ঠেসাঠেসিতে উভয় আম্রই নষ্ট হইয়া যায়। এজন্ত এক একটী আম্রকে স্বতন্ত্রভাবে পাড়িতে হয়। ইহার

আকার লম্বা ধরণের, রং হরিদ্রাবর্ণ। ওজনে একপোয়া হইতে দেড়পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আস্বাদন অতি সুমিষ্ট কিন্তু খোসা এত পাত্‌লা যে ছুরীর ভর সহিতে পারে না। খাইতে এত ঠাণ্ডা বোধ হয়, যেন সদ্য বরফ হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছে এবং পেটের মধ্যে যতদূর যায় বেশ জানিতে পারা যায়। এই আম্র প্রায় সকল নওয়াবদিগের বাগানে আছে। মৃত্তিকাভেদে কোন কোন আম্রের স্বাদের তারতম্য হয়। এই আম্রকে অতি যত্নে ৪-৫ দিন জাগে রাখিলে খাইবার উপযুক্ত হয়। শতকরা ৩৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পাকিয়া শেষ হইয়া যায়।

নাজিম-পসন্দ। এই আম্রের গাছ স্বভাবতঃ লম্বাকৃতি হয় এবং দুই একটী গাছ দেখিলেই অপর গাছকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। এই আম্রের গাছ কোথা হইতে মুরসিদাবাদে প্রথম আনীত হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু প্রাচীন প্রাচীন গাছ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইহা বহু বৎসর হইতে মুরসিদাবাদে আছে। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নওয়াব-নাজিম নওয়াব ফেরাডুন জা—বর্ত্তমান নওয়াব বাহাদুরের পিতামহ—এই আম্র বিশিষ্টরূপে পসন্দ করিতেন এবং সেইজন্যই ইহার নাম 'নাজিম-পসন্দ' হইয়াছে।

প্রায় সকল নওয়াবদিগের বাগানেই এই আম্রের গাছ আছে। এই আম্রের আকার গোল, এবং ওজন প্রায় দেড় পোয়া হইবে। পাকা অবস্থায় রং হরিদ্রাবর্ণ। জ্যৈষ্ঠমাসে

পাকিতে আরম্ভ হইয়া আষাঢ় মাসের ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত থাকে। এই আম্র সাধারণ বা মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে সুবিধাজনক নহে তাহার কারণ এই যে, কালাপাহাড় আম্রের অপেক্ষাও ইহাকে খাইবার জন্য ঠিক লগ্নকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়। উত্তমরূপে পাকিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইহাকে খাইলে অত্যন্ত টক্ বোধ হয় এবং অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে বিস্বাদ ও ঝাল বোধ হয়। এত পল, অনুপল গণিয়া কয় জন আম্র খাইতে পারে। ঠিক উপযুক্ত সময়ে খাইতে পারিলে সুপক্ক বোম্বাই বা আলি-পসন্দ প্রভৃতি উত্তমজাতীয় আম্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইবে। পূর্ব্বে নবাবের দরবারে আম্রের ঘরোয়া লড়াই (Private Exhibition) হইত। তথায় নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট আম্র আনীত ও পরীক্ষিত হইত। কিন্তু যাবতীয় উৎকৃষ্ট আম্র নাজিম-পসন্দ আম্রের নিকট হার মানিয়াছিল! আমরা শুনি-য়াছি, পূর্ব্বে উত্তমরূপে তুলা পিঁজিয়া, তাহারই উপর এই আম্রকে গৃহমধ্যে বিস্তৃত করিয়া রাখা হইত। আম্রের এত তদ্বির দেখিয়া সহজেই লোকের মনে কৌতূহল জন্মিতে পারে, আমাদিগেরও হইয়াছিল এবং সেই কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা এই সকল গুহ্য কথা পরীক্ষা করিতে ক্ষান্ত হই নাই। পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, এই আম্রে সামান্য আঘাত লাগিলেই বিস্বাদ হইয়া যায়। সুপক্ক হইবার পূর্ব্বে বা পরে খাইলে যাহা হয়, তাহাও শুনা কথার সহিত মিলিয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে জানিয়াছি যে, তুলা বা তদনুরূপ কোন কোমল পদার্থ

ভিন্ন অন্য পদার্থের উপরে ইহাকে দুই এক দিন রাখিলেই আম্রের রক্ষিতাবস্থার উপরি ও নিম্নদেশের স্বতন্ত্র আস্বাদন হয়, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস থাকিলে একবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া যায়। নাজিন-পসন্দের দুইটী সতেজ গাছ রৈইসবাগে আছে।

পাঞ্জা-পসন্দ। ইহার গাছ খাস চুণাখালিতে আছে। বহুদিবস যাবৎ এই গাছ ভগিরথপুরের জমীদারগণের জনৈক প্রজার বাটীতে ছিল। প্রায় তিন বৎসর হইতে এই গাছ শ্রীযুক্ত নওয়াব বাহাদুরের দখলে আসিয়াছে। গরীব প্রজাটী অনেক দিন চেষ্টা করিয়া এই গাছটী রাখিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায়, আদালত কর্ত্তৃক তাহার সম্পত্তি নীলাম হইলে, নওয়াব মোটা সৈয়দ সাহেব তাহা খরিদ করেন। পরে, তাহা উক্ত নওয়াব বাহাদুরের অধিকারে আইসে। শুনা যায়, প্রকারান্তরে ২।৪ টী কলম অপরের বাগানে গিয়াছে। এই আম্র দেখিবার বা পরীক্ষা করিবার আমাদের সুযোগ হয় নাই, এজন্য এ সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিতে পারা গেল না।

ফয়কল-বয়ান। ইহা মুরসিদাবাদের আদিম আম্র। নওয়াবদিগের বাগানে অতি প্রাচীন প্রাচীন গাছ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী গাছকে শতাধিক বৎসরেরও অধিক বলিয়া অনুমান হয়। এই আম্রের বিশেষ কোন গুণ নাই, তবে ভাল জাতীয় আম্রের যে যে গুণ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় তৎসমুদায় ইহার আছে। ওজনে প্রায় ৵৷৹ আধসের, এবং রং সিন্দুরিয়া। ইহা

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। শতকরা ৩৲ হইতে ৪৲ টাকা দরে বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। চুগাপালির সিন্দুরিয়ার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে।

পেয়ারা।

PSIDIUM GUAJAVA.

GUAVA.

পেয়ারা দক্ষিণ আমেরিকার ফল, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা এতই প্রচুর ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে যে, ইহাকে এক্ষণে ভারতীয় ফল বলিলেও চলে। অনেক জঙ্গল মধ্যেও পেয়ারা গাছ দেখা যায় কিন্তু তাহার ফল বড় নিকৃষ্ট রকমের হয়। বাঙ্গালা দেশে যে পেয়ারা জন্মে, তাহাপেক্ষা বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফল সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও আঘ্রাণবিশিষ্ট। কাশির পেয়ারা বিখ্যাত কিন্তু এদেশে সে গাছ তেমন গুণবিশিষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গলার আব-হাওয়া অপেক্ষা পশ্চিম দেশের আব-হাওয়া ইহার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তবে যত্ন করিয়া আবাদ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে সফল হওয়া যায়।

মোটামোটি পেয়ারাকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, লাল ও সাদা। লাল অপেক্ষা সাদা পেয়ারা অধিকতর মিষ্ট হয়। কাফ্রি নামক এক জাতীয় পেয়ারা আছে, তাহার গাত্র সমান নহে. কোথাও উচ্চ ও কোথা নিচু, কিন্তু খাইতে মন্দ নহে।

ভাল পেয়ারার গুণ এই যে, উহার ছাল পাত্‌লা হয়, বীচি কম হয় এবং শাঁস সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত হয়।

বীজ ও গুটী কলমে ইহার চারা হয়। বীজের চারা ফলিতে চারি পাঁচ বৎসর সময় লাগে, আর কলমের চারা দুই বৎসর মধ্যেই ফলিয়া থাকে, কিন্তু এত শীঘ্র ফলিতে দিলে গাছ অধিক বাড়িতে পারে না এবং শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

ফাল্গুন, চৈত্র মাসে গাছে ফুল ধরে এবং আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ হইতে প্রায় ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

বর্ষাকালে হাল্‌কা মাটিতে বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজ সুপক্ক ফলের হওয়া আবশ্যক। হাপোরে পাতো দিয়া চারা তৈয়ার হইলে, এবং চারাগুলি ৫।৬ ইঞ্চ বড় হইলে, দ্বিতীয় হাপোরে ফাঁক ফাঁক করিয়া বসাইয়া যথানিয়মে পালন করিতে হয়। দ্বিতীয় হাপোরে স্থানান্তর করিবার সময়ে চারাদিগকে 'থাসী' করিয়া দিলে ভবিষ্যতে উহা উচ্চে অধিক বড় না হইয়া পার্শ্বদেশে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া অধিক ফল প্রদান করে। চারাগুলিকে দ্বিতীয় বৎসরের আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাসের যে কোন সময়ে ক্ষেত্র মধ্যে আট হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে।

বর্ষার প্রারম্ভেই অর্থাৎ আষাঢ় মাসেই গুটী কলম বাঁধিতে হয়। এই সময়ে অর্দ্ধপক্ক শাখায় কলম বাঁধিয়া যত্ন করিলে এক মাস মধ্যেই কলম তৈয়ার হইয়া যায়। তখন কলম কাটিয়া কিছু দিন হাপোরে রাখিবার পরে যখন উহারা কিঞ্চিৎ সাম-

লাইয়া উঠিবে, তখন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসেই ক্ষেত্রে রোপণ করিতে পারা যায়।

চারা গাছগুলিকে গবাদি পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি গাছকেই বেড়া দ্বারা ঘেরিয়া দেওয়া আবশ্যক। চারা গাছের জলের অভাব না হয়, এজন্য উহাকে আবশ্যক মত জল যোগাইতে হইবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া উত্তমরূপে কোপাইয়া দিতে হয়, এবং প্রতিবৎসর এই সময়ে উহার গোড়ায় নূতন মাটি বা সার দিলে গাছ সতেজ থাকে। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছে যখন ফল ধরিবে, তখন সেই ফলগুলিকে ছেঁড়া কাপড় বা চট্ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে কাটবিড়াল, বাদুড় ও পক্ষীতে ফল নষ্ট করিতে পারে না।

পেয়ারা গাছের পাতা মুড়িয়া তন্মধ্যে পীপিলিকায় বাসা করে। যখন এইরূপ বাসা দেখা যাইবে, তখন উহা ভাঙ্গিয়া না দিলে, ক্রমে ইহার বংশ বৃদ্ধি হইয়া গাছময় ঐরূপ বাসা হয়। ইহাতে ক্রমে গাছের অনিষ্ট হয়। গাছে যে সমুদায় শুষ্ক ও রুগ্ন শাখা প্রশাখা থাকিবে তাহা কাটিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

পেঁপে।

CARICA PAPAYA.

PAPAW.

পেঁপের স্বাভাবিক জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা কিন্তু ভারত-বর্ষের সাধারণ জল-হাওয়া অনুকূল হওয়ায়, ইহা এ দেশে প্রচুর-রূপে জন্মে।

পেঁপে ফল বিশেষ হজ্‌মী ও পুষ্টিকর এবং পক্কাবস্থায় অতি উপাদেয়। কাঁচা অবস্থায় ইহাতে নানাবিধ ব্যঞ্জন হয় এবং পাকিলে সদ্য খাইবার সামগ্রী। পেঁপে গাছে দুগ্ধের ন্যায় রস বা আটা বাহির হয়, তাহাতে ১০।১৫ মিনিট কাল, কাঁচা মাংস ভিজাইয়া রাখিলে, ঐ মাংস অতিশয় শীঘ্র গলিয়া যায়। সহজে মাংস সিদ্ধ করিবার জন্য অনেকে মাংসের সহিত কয়েক খণ্ড কাঁচ পেঁপে দিয়া থাকেন। আবার ইহাও শুনা যায় যে, নিতান্ত শক্ত কাঁচা মাংসকেও ক্ষণকালের জন্য পেঁপে গাছের উপরে ঝুলাইয়া রাখিলে উহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। নিগ্রো জাতি সাবানের পরিবর্ত্তে ইহার পাতা দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকে।

পেঁপে গাছ দুই প্রকারের হইয়া থাকে,—এক প্রকার ফলন্ত ও অপর প্রকার অফলন্ত বা রাঁড়া। ফলন্ত গাছ স্ত্রী জাতীয় এবং অফলন্ত পুংজাতীয়। শেষোক্ত জাতীয় গাছে দুই তিন হাত লম্বা ঝুরি বাহির হইয়া তাহাতে ফুল ও ফল ধরিয়া

থাকে। আর স্ত্রীজাতীয় গাছের কাণ্ড হইতে ঈষৎ লম্বা ডাঁট বাহির হয় এবং তাহাতেই ফুল ও ফল হয়। পুরুষ জাতীয় গাছে যে ফল হয় তাহা আস্বাদন বিহীন, কিন্তু স্ত্রীজাতীয় গাছের ফল উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট। উদ্যানমধ্যে পুংজাতীয় গাছ রাখিয়া কোন লাভ নাই।

পেঁপের জন্য দো-আঁশ মাটি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। পরে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে উহাকে কোপাইয়া ও মাটির যথাবিধি পাট করিয়া, আষাঢ় মাসের প্রথমেই ৪।৫ হাত অন্তর এক একটী মাদায় ২।৩টী সুপক্ক ফলের বীজ রোপণ করিবে। আকাশের জল পাইলে মাদায় জল সেচনের আবশ্যকতা নাই, নতুবা আবশ্যকমত উহাতে জল দিতে হইবে। মাদায় সকল বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে প্রতি মাদায় একটীমাত্র সবল ও সুপুষ্ট গাছ রাখিয়া অপরগুলিকে উঠাইয়া খালি মাদায় পুতিয়া দিলে চলে। আর আবশ্যক না থাকে, তবে ফেলিয়া দিতে হইতে। উল্লিখিত প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন মাদায় বীজ রোপণ করা অপেক্ষা হাপোরে বীজ পাতো দেওয়ার আমি বিশেষ পক্ষপাতী, কারণ পাতো দেওয়া বীজোৎপন্ন চারা, হাপোরে রোপিত চারা অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও ফলবতী হইয়া থাকে। অল্প স্থানে বীজ পাতো দিলে তাহার যেরূপ পাট হওয়া সম্ভব, বিস্তৃত ক্ষেত্রে বা মাদায় পুতিলে সেরূপ সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত চারা স্থানান্তর করিলে গাছ স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ ও ফলবতী হয়। যাহা হউক, যে সময়ে মাদায় বীজ রোপণ করিতে হয়, সেই সময়েই উহাকে পাতো দিতে হয়।

পাতো দেওয়া চারাগুলি আট অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে বর্ষার দিনে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিতে হয়। মাদার ব্যবধান সম্বন্ধে কিছু সতন্ত্র নিয়ম নাই। মাদায় পুকরিণীর পাঁক কিম্বা পোড়া-মাটি দিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

পেঁপে গাছের চোক, অর্দ্ধ-পক্ক শাখা এবং ফেঁকড়ীতে চারা হইয়া থাকে। চোক বা ফেঁকড়ীতে চারা করিতে হইলে গাছ হইতে উহা কাটিয়া আনিয়া ছায়াবিশিষ্ট স্থানে চর-বালির হাপোরে পুতিয়া দিতে হয় এবং যাবৎ না অঙ্কুরিত হয়, তাবৎ উহার উপরে ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর গাছ বাহির হইলে বা শাখার শিকড় নির্গত হইলে যথানিয়মে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিবে।

ক্ষেত্রে চারা পুতিবার ৭৮ মাস মধ্যেই গাছে ফুল ধরে। তখন প্রতি বিঘায় ২।৩টী মাত্র পুংজাতীয় গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট পুংজাতীয় গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত। স্ত্রীজাতীয় গাছের পুষ্প সমূহের গর্ভসঞ্চারের জন্য পুংজাতীয় গাছের প্রয়োজন; এইজন্য দুই তিনটী ঐ জাতীয় গাছ রাখিবার কথা বলা গেল। পুংজাতীয় অধিক গাছ থাকিলে কেবল মাত্র স্থানাধিকার ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যা জল দাঁড়ায়, এজন্য গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বর্ষা অতিবাহিত হইলে ক্ষেত্রে যথাবিধি ছেঁচ না দিলে, গাছের পাতা ঝরিয়া যায়, এবং ফলও বড় বা সুমিষ্ট হয় না। বর্ষার পূর্ব্বে অর্থাৎ গাছে

ফুল ধরিবার পূর্ব্বে গোবর-সার দেওয়া আবশ্যক। এই কার্য্য বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে করিলেই চলিতে পারে। গাছগুলি তিন চারি হাত উচ্চ হইলে, যদি উহার মস্তক ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া অনেক ফল প্রদান করে।

পেঁপে গাছের কাণ্ডে ফল ধরে এবং এক একটী গাছে একত্রে ১০০।১৫০টী ফল ধরিয়া থাকে। কিন্তু যদি কতকগুলি সুপুষ্ট বড় ফল রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বৃক্ষস্থিত ফল অধিকতর বড় হয়। ভালরূপ পাট করিলে এক একটী ফল নারিকেলের ন্যায় বড় হয়।

পেঁপের আবাদ অতিশয় লাভের জিনিষ। বাজারে আনিলে উহা বিশেষ দরে বিক্রয় হয়। সময়ে সময়ে ভাল পেঁপে দুই আনাতেও বিক্রয় হইয়া থাকে।

কলা।

MUSA.

PLANTAIN.

পৃথিবীতে যত প্রকারের ফল আছে, তন্মধ্যে কলার ন্যায় উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ফল আর নাই। বাঙ্গালাদেশে ইহা সহজে এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কাঁচা-কলা, চাম্পা,

চাটিম, মর্ত্তমাণ, অনুপম, চিনি-চাম্পা, বিটষবা, মোহন বাঁশি, কানাই-বাঁশি, রামকেলী, অগ্নিশ্বর প্রভৃতি নানা জাতীয় কলা এদেশে জন্মিয়া থাকে। এই সকল কলার মধ্যে কেবল কাঁচা-কলা কাঁচা অবস্থায় ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার হয় এবং অপরগুলি পাকা অবস্থায় খাইতে হয়।

কলাগাছে অতি অল্প দিন মধ্যেই ফল হয় এবং ইহার আবাদ বিশেষ লাভজনক। দুই তিন বিঘা জমীতে কলার আবাদ করিলে একটী ছোট গৃহস্থের সংস্থান হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা একটী প্রাচীন প্রবাদ উদ্ধৃত করিলাম—

"তিনশ' ষাট ঝাড় কলা গাছ রুয়ে,
থাক্‌গে চাষা ঘরে শুয়ে।
তুল গেঁড়ো, না কেটো পাত,
তাতেই মান যশ, তাতেই ভাত॥"

ইহার অর্থ আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই চারিটী পংক্তির মধ্যে কলা চাষের প্রণালী ও লাভের কথা স্পষ্টা-ক্ষরেই বলা হইয়াছে।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটীর চারিদিকে কলার যথেষ্ট আবাদ হয়। একটী একটী কলাবাগানের একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত নজর চলে না, এবং এই সকল বাগানের কলা বৈদ্যবাটীর প্রতি শনি ও মঙ্গলবারের হাটে আনিত হয় এবং ব্যাপারীগণ তাহা খরিদ করিয়া স্থানান্তরে চালান দেয়। প্রতি হাটে অর্থাৎ হাটবারে ১৫০০০৲ হইতে ২০০০০৲ টাকার কলা

এক বৈদ্যবাটীর হাটে বিক্রয় হয়।* এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে যে কত হয় তাহার ঠিক নাই।

কলা গাছের কোন অংশ নষ্ট হয় না। ইহার ফল, পাতা, মোচা ও থোড় বিক্রয় হয়। এ ছাড়া শুষ্ক পাতা ও বাস্না কাগজ তৈয়ারির জন্য বিক্রয় হয়। এত লাভের জিনিষ সত্ত্বে ও সাধারণতঃ লোকে ইহাকে তাদৃশ যত্ন সহকারে পালন করে না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

নিচু জমী অর্থাৎ যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়-এরূপ জমী ছাড়া সকল প্রকার জমীতেই কলা জন্মিয়া থাকে। অকর্ম্মণ্য জমীকে আবাদোপযোগী করিবার জন্য লোকে তথায় প্রথমে কলা গাছ রোপণ করে। নীরস জমীতে কলাগাছ রোপণ করিলে মাটী রসা হয়। ফলের নূতন বাগান করিতে হইলে প্রথমে জমীতে কলা গাছ পুঁতিলে দুইটী লাভ হয়,—প্রথমতঃ ফলের গাছ বড় হইয়া উঠিতে উঠিতে কলার কয়েকটী ফসল পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ কলা গাছের এঁটে প্রভৃতি পচিয়া গিয়া জমীকে সারবান করে। এ বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে—

> "আগে পুতে কলার ঝাড়।
> বাগান করবে তা'র পর॥
> কলা গাছে না শুকায় মাটী।
> বাগান হয় তার পরিপাটি॥"

---

* কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু, প্রথমভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কলা গাছ পুতিবার অগ্রে জমীতে উত্তমরূপে চাষ দিতে হয়। প্রথমতঃ একবার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া যদি লাঙ্গল ও মই দেওয়া যায় তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তদনন্তর উহাতে যে সমুদায় গাছের শিকড় ও তৃণাদি থাকে তাহা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। জমি তৈয়ার হইলে আট হাত অন্তর একহাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া কলার তেউড় পুতিতে হইবে। তেউড়কে মুরসিদাবাদে 'পোয়ালী' কহে। রোপণ করিবার সময় সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে, যথাঃ—

"বলে গিয়াছেন, রাবণ,
কলা পুত্‌বে আষাঢ় শ্রাবণ।'

অন্য একটী যথাঃ—

"বলে গিয়াছেন রাবণের নাতি।
কলা পুত্‌বে আশ্বিন কাতি॥"

প্রথমোক্ত শ্রুতির সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। বর্ষাকালে গাছ পুতিলে গাছ খুব বাড়িয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা 'ফুলিয়া' যাইবার সম্ভাবনা। গাছ 'ফুলিয়া' গেলে তাহাতে ফল হয় না বা হইলেও তাহা নিকৃষ্ট হয়। বরং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপণ করা অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু বিশেষ তাড়াতাড়ি না থাকিলে, ফাল্গুন মাসে কলার তেউড় রোপণ করাই যুক্তিসঙ্গত। ফাল্গুন মাসে রোপণ করিলে দুই তিন মাসের প্রখর রৌদ্রে গাছ আপাততঃ বাড়ে না, বরং উহার উপরিভাগ শুষ্ক ও

মৃতপ্রায় হইয়া যায়, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই একটী বৃষ্টি পাইবা মাত্র তাহার গোড়া হইতে নূতন ফেঁকড়ী বা পোয়ালি জন্মে, পরে সেই গাছ সম্মুখে বর্ষা পাইয়া সুপুষ্ট হইয়া বাড়িতে থাকে। এইরূপে গোড়া হইতে চারা বাহির হইলে প্রধান গাছটীকে মাটী ঘেঁসিয়া কাটিয়া দিতে হইবে।

প্রতি ঝাড়ে তিনটীর অধিক গাছ রাখা ব্যবস্থা নহে। এক ঝাড়ে অধিক গাছ থাকিলে কোনটী সবল বা সুপুষ্ট থাকে না, পরন্তু সকল গুলিই ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া যায়। প্রতি ঝাড়ে তিনটী মাত্র গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট যে কয়টী গাছ জন্মিবে, তৎসমুদায় তুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে রোপন করিবে। ইহাতে ঝাড়গুলি ত ভাল থাকেই, তাহা ছাড়া ঝাড় হইতে একবৎসর মধ্যে অনেকগুলি চারা জন্মিয়া থাকে। কলা বাগানের আয়তন বৃদ্ধি করিবার পক্ষে এই প্রথা বিশেষ লাভজনক।

ঝাড়ের বড় গাছটী ফল প্রদান করিবার পরে উহাকে কাটিয়া দিলে, মাঝারি গাছটীকে এক্ষণে বড় এবং ছোটটীকে মাঝারি করিয়া, নূতন একটী তেউড়কে ছোট বলিতে হইবে। এইরূপে একটী গাছ উঠিয়া গেলে, অপর একটী নূতন তেউড় থাকিতে দিতে হইবে। কিন্তু যতদিন তিনটী গাছ এক ঝাড়ে মজুত থাকিবে, ততদিন চতুর্থ গাছ থাকিতে দেওয়া কোনমতে উচিত নহে। গাছের চারা তুলিয়া লওয়া যেমন একটী বিশেষ কার্য্য, শুষ্ক পাতাগুলি কাটিয়া এবং মৃত গাছের এঁটে বা গোড়া তুলিয়া ফেলাও তদনুরূপ আবশ্যক।

কার্ত্তিকমাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত কলা বাগানের মাটি কোপাইয়া দিয়া, পরে গাছের গোড়ায় মাটী উচ্চ করিয়া দিতে হয়। এইরূপে কলা গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া দিলে বাগানটী পরিষ্কার থাকে এবং গাছগুলি ও সবল থাকে এবং দেখিতেও সুশ্রী হয়।

সাধারণতঃ এদেশে কলা গাছে কোনরূপ সার দিবার প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু খৈল ইহার বিশেষ সার। ইহা গাছের গোড়ায় দিলে গাছ বলবান হয় এবং উহাতে যে কাঁদী হয়, তাহা বড় হইয়া অনেক ফল ধারণ করে। মুরসিদাবাদে থাকিতে আমি কলা গাছে কয়েক প্রকার সার দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। কোন গাছে পুরাতন রাবিসের গুঁড়া, কোন গাছে খৈল চূর্ণ, আবার কোন গাছে খৈল ও অস্থিচুর্ণ দিয়া দেখিয়াছি যে, এই তিন প্রকারের সারই কলা গাছে বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল। যে ঝাড়ে অস্থিচুর্ণ ও খৈল দেওয়া হইয়া ছিল, তাহার গাছগুলি বিশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়া ছিল। ইহার গাছগুলি যেমন সতেজ, পাতগুলিও তেমনি লম্বা ও প্রশস্ত হইয়া বড় কাঁদিযুক্ত ফল প্রসব করিয়াছিল। রামকেলী ও কানাই-বাঁশী,—এই দুই জাতীয় কলাতেই পরীক্ষা করিয়া ছিলাম। প্রতি ঝাড়ে একসের বেড়ীর খৈল, অর্দ্ধসের অস্থি-চূর্ণ দেওয়া হয় এবং মধ্যে মধ্যে গাছে জল দেওয়া হইত। বর্ষাকালে গাছে জল দিবার আবশ্যক হয় না, কিন্তু অন্য সময়ে কলা বাগানে মাসে দুই না হয়, একবারও ছেঁচ দেওয়া আবশ্যক। মুরসিদা-

বাদস্থ রৈইসবাগে আমি নানাজাতীয় কলা গাছ রোপণ করিয়াছিলাম এবং পরীক্ষারও সূত্রপাত করিয়াছিলাম। কিন্তু রৈইসবাগ আমার বাসা হইতে অনেক দূর হওয়ায় সদা সর্ব্বদা তথাকার কার্য্যাদি পরিদর্শনের সুবিধা হইত না, এবং লোকজনদিগের বলিয়া আসিলে, তাহারা আমার ঠিক মনের মত কাজ করিতে পারিত না। এজন্য বিশেষ পরীক্ষা সকল নিজ বাসা কুতবপুরের বাটীর সংকীর্ণ স্থানে করিতাম। রামকেলী ও কানাইবাঁশী গাছ এইজন্য আমার বাগাতে পুঁতিয়াছিলাম। এই গাছ বোধ হয় এখনও তথায় আছে। রামকেলী-গাছটী আমার বিশেষ যত্ন ও আদরের জিনিষ ছিল। বালক বালিকাগণ সেই গাছটীর সামান্য পাতাটী ছিঁড়িলে আমি তাহাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ হইতাম। সেই গাছটীকে এখনও এক একবার দেখিবার ইচ্ছা হয়।

কলা গাছের পাতা কাটিলে কেবল যে গাছটী শ্রীহীন হয় তাহা নহে, ইহাতে গাছ হীনবল হয়। ফলতঃ উহার ফলও অধিক ও সুপুষ্ট হয় না। অতএব গাছের পাতা কেহ না কাটিয়া লয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্ষাকালে পাতা কাটিয়া লইলে তত বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অন্য সময়ে কোন মতে কাটা উচিত নহে। পাতা ব্যবহার বা বিক্রয় করিবার জন্য গাছের আবশ্যক হইলে, বাঙ্গালা-কলার গাছ রোপণ করা উচিত। 'ডোরে' কলাকে মুরসিদাবাদে 'বাঙ্গালা' কলা বলিয়া থাকে। এই জাতীয় কলা অতি নিকৃষ্ট কিন্তু উহার গাছ ও পাতা বড় হইয়া থাকে, এজন্য পাতার পক্ষে

বিশেষ উপযোগী। কাটালী কলাও লোকের বড় প্রিয় নহে, সুতরাং পাতার জন্য উহাও রোপণ করিতে পারা যায়। এই দুই জাতীয় গাছ হইতে পাতা ছাড়া, মোচা ও থোড় পাওয়া যায়। অন্য জাতীয় গাছের মোচা ও থোড় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ফলের জন্য উহা অনেক দিন গাছে সংলগ্ন থাকায় মোচা ছোট হইয়া যায় এবং থোড় শক্ত ও ছিব্‌ড়াযুক্ত হইয়া আহারের অনুপযোগী হইয়া থাকে।

পাতার জন্য যে সকল গাছ রোপণ করা যায় তাহাতে মোচা আসিলেই, মোচাটী কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটী কাটীয়া লইতে হয়। তখন গাছটী অধিক দিবস দণ্ডায়মান থাকিলে থোড় খারাপ হয়। তদনন্তর সেই গাছের এঁটে বা গোড়াটী পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া স্থানটী মাটি-পূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ডোরে ও কাটালী কলার এইরূপ পাট করিতে হয়। কাটালী কলা অনেক সময় পূজাদিতে আবশ্যক হয় বলিয়া মোচা অবস্থায় গাছ না কাটিয়া, উহাকে ফলিতে দেওয়া হয় এবং সেই ফল পাকিলে পরে গাছ কাটা হইয়া থাকে।

কাঁচা ফলের জন্য কাঁচে-কলার গাছ। ইহার ফলগুলি সুপুষ্ট হইলে গাছ কাটিতে হয়।

পাকা ফল খাইবার উপযোগী কলা গাছের মোচা ভাঙ্গিবার একটী সময় আছে। যতদিন পর্য্যন্ত মোচা হইতে ভাল ফল বাহির হইতে থাকে, ততদিন মোচাটী কাঁদীতে সংলগ্ন থাকা আবশ্যক। পরে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল দেখা দেয়, তখন মোচাটী

ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। পাকা কাঁদি কাটিয়া লইবার অব্যবহিত পরে গোড়া হইতে গাছটীকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গাছে কাঁদী নামিলে, গাছে প্রচুর পরিমাণে জল দিলে ফল পুষ্ট ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। কাঁদী পাকিবার উপযোগী হইলে, কাটবিড়াল, হনুমাণ, কাক ও অন্য পক্ষীতে ফল খাইয়া ফেলে ও নষ্ট করে। কিন্তু এই অবস্থায় কাঁদীটীকে চটের থোলে দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিলে আর তাহা নষ্ট হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কাঁদী ঢাকা থাকিলে ফল বড় মধুর ও কোমল হয়। রৈইসবাগে ইহা আমি বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

এক প্রকার পোকাতে কলা গাছ ছিদ্র করিয়া দেয়, কিন্তু উহার সত্বর প্রতীকার না করিলে গাছটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। গাছ হইতে সহজে যদি পোকায় আবাস নষ্ট করিতে পারা যায় তাহা হইলে ভালই, নতুবা ঝাড় হইতে পোকাগ্রস্থ গাছটীকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময়ে ফলের উপর ছিট্ ছিট্ কাল দাগ হইয়া থাকে। গাছের গোড়া পোকাগ্রস্থ হইলে এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস বাতাস লাগাইয়া এবং পোকার আবাস নষ্ট করিয়া নূতন মাটি দ্বারা সেই স্থান ঢাকিয়া দিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গাছ রোপণের জন্য তেউড় ব্যবহার হয়। তেউড় যদি বড় হয় তাহা হইলে উহার উপরিভাগ কাটিয়া বাদ দিয়া, কেবলমাত্র এঁটে বা গোড়াটী পুতিয়া দিলেই

চলে। তেউড় পুতিবার পূর্ব্বে উহার শিকড়গুলি ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে সকল শিকড় গাছ উঠাইবার কালে ছেঁচিয়া বা পেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে কাটিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর সেই গাছের গোড়া বা এঁটেগুলিকে বালি মিশ্রিত তরল গোমায়ূতে একবার ডুবাইয়া জমীতে যথানিয়মে পুতিয়া দিলে গাছ শীঘ্র বাড়িয়া উঠে।

বাগানে রাখিবার উপযোগী কয়েক জাতীয় কলা গাছের বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

চাঁম্পা ;—ইহার ফল ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুগন্ধবিশিষ্ট। পাতার মধ্যেকার শিরা লালাভ।

চিনি-চাম্পা ;—ইহা চাম্পারই জাতিবিশেষ। চাম্পা অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্রাকার কিন্তু অধিকতর সুমিষ্ট। এক কাঁদীতে প্রায় দেড়শত হইতে দুইশত ফল ধরে।

মর্ত্তমান ;—চাম্পার ন্যায় গন্ধ, কিন্তু উহাপেক্ষা বড় ফল হয়। পাতার শিরায় কোন বিশেষত্ব নাই।

ঢাকাই মর্ত্তমান ;—মর্ত্তমান অপেক্ষা সুগন্ধবিশিষ্ট এবং রসাল এবং সকলের প্রিয়। ইহার পাতার গোড়ার দিকের বর্ণ প্রায় লাল এবং পাতার নিম্নভাগ ঈষৎ শ্বেত গুঁড়াযুক্ত বলিয়া অনুমান হয়।

কাঁটালী ;—ইহার গাছ সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। ফল মর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে, কিন্তু খাইবার উপযোগী নহে। মোচা ও থোড় ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়া চলে।

কাঁচা কলা ;—গাছ বড় বড় হয়। ফল পল্ বা কোন্-বিশিষ্ট এবং প্রায় ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়। কাঁচা ফল তরকারীতে এবং অনেক পূজাদিতে ব্যবহার হয়।

কাবুলী ;—গাছ খর্ব্বাকৃতি, এবং দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়। ছোট গাছে বড় কাঁদী, দেখিতে বড় মনোহর। গত বৎসর মুরসিদাবাদস্থ আমার জনৈক বন্ধু বাবু রামগোপাল রায়ের বাটীতে এই গাছে একটী কাঁদী প্রায় তিন হাত লম্বা হইয়াছিল এবং তাহাতে যে ফল হইয়াছিল তাহা প্রায় সাত ইঞ্চ লম্বা ও তদনুরূপ মোটা, এবং আস্বাদন ও তেমনি মিষ্ট ও রসাল হইয়াছিল। রামগোপাল বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কয়েকটী ফল খাইতে দিয়াছিলেন। খাইয়া বাস্তবিক বড় আরাম বোধ হইয়াছিল।

রামকেলী ;—রৈইসবাগে ইহার অনেক গাছ রোপণ করিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে নিজ বাসা কুতবপুরের খানসামানীতেও পুতিয়াছিলাম। রৈইসবাগ অপেক্ষা 'খান-সামানীতে' যে গাছটী হইয়াছিল তাহার ফল অপেক্ষাকৃত বড় ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। কাঁচা অবস্থায় ইহার ফলের বর্ণ মেটে সিন্দুরের ন্যায় এবং পাকিলে হরিদ্রা ও সিন্দুর মিশ্রিত রামধনুবৎ এক অপূর্ব্ব রং ধারণ করে। ফলের সুগন্ধে স্থান আমোদিত হয়। ইহার গাছের কাণ্ড এবং পাতার মধ্যস্থিত শিরা লাল বর্ণের।

কাঁনাইবাঁশী ;—বৃহজ্জাতীয় কলা। এক একটী ফল

প্রায় ৯ ইঞ্চ লম্বা হয়।. পাকিলেও সবুজ থাকে। সুপক্ক হইলে খাইতে অতি সুমিষ্ট, ও মাখনের ন্যায় কোমল। সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে এই কলা ভাল লাগিয়াছিল। ইহার গাত্র সুগোল না হইয়া পল-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। একটি কাঁদীতে ৭০।৮০টি ভাল ফল জন্মিয়া থাকে।

বিগত তুইতিন বৎসর পূর্ব্বে কাশিপুর হর্টিকলচার্ল ইনষ্টিটীউশনের জনৈক ছাত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ঘোষ বৃক্ষাদি সংগ্রহের নিমিত্ত শিঙ্গাপুর, পিনাং প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে গিয়া অন্যান্য গাছের মধ্যে কয়েকটী স্থানীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় কলা গাছ আনিয়াছিলেন। ঐ সকল কলা গাছ উক্ত বিদ্যালয়ের বাগানে রোপিত হইয়াছে এবং কয়েকটী গাছে ইতিমধ্যে ফলও হইয়াছিল। যে কয়কটী গাছ ফলিয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

তাণ্ডো ;—যবদ্বীপ (Java) ইহার স্বাভাবিক বাসস্থান। ফলগুলি ১২।১৩ ইঞ্চ লম্বা এবং পাঁচ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ কাঁচা অবস্থায় ইহাতে ব্যঞ্জন তৈয়ার করে। ফল পরিপক্ক হইলে কাঁটালী কলার ন্যায় আস্বাদন হয়। গাছের কচি পাতার স্থানে স্থানে রক্তের ন্যায় দাগ থাকে কিন্তু পাতা যত পুরাতন হইতে থাকে তত সেই দাগ মিলাইয়া যায়।

শুশু ;—ইহার স্থানীয় অর্থ দুগ্ধ। ইহার ফলের আস্বাদন দুগ্ধবৎ এবং উহার আকার দেশীয় চাম্পার ন্যায়। ফলের গাত্র উচু-নিচু, অন্যান্য কলার ন্যায় সমতল নহে।

রাজা ;—ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় কলা। ইহার আস্বাদন ক্ষীরবৎ। গাছের আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। ফলের আকার মর্ত্তমান কলার ন্যায়।

ইজো ;—পিনাংয়ের উৎকৃষ্ট জাতীয় কলার মধ্যে ইহাও একটী। ফল ছোট কিন্তু অতিশয় সুমিষ্ট ও নরম।

চাষা-ভূষা লোকে বলিয়া থাকে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা গাছের এঁটে অল্প পরিমাণে কাটিয়া পরস্পর জোড় বাঁধিলে যে গাছ জন্মে, তাহাতে একই কাঁদাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা ফলিয়া থাকে। একথার কোন সারবত্তা নাই, কারণ কলা, ঘাস, বাঁস, তাল, খেজুর প্রভৃতি (Monocotlydon) জাতীয় গাছের জোড়-কলম জন্মে না। এই জাতীয় গাছের প্রাকৃতিক গঠনের বিশেষত্বে পরস্পরে জোড় লাগিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

আনারস।

ANNANASSA SATIVA.

PINE-APPLE.

আনারসের ন্যায় অম্ল-মধুর আস্বাদনবিশিষ্ট ফল দুনিয়ায় আর আছে কি না জানি না। ইহার আস্বাদন যেমন স্নিগ্ধকারী আঘ্রাণও ততোধিক মনোহর। ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে ইহা জন্মে। শিঙ্গাপুর, পিনাং ও মালয় দেশে, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় আনারস জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে প্রচুর

জন্মে বলিয়া সাধারণতঃ লোকে ইহার আবাদে বিশেষ যত্ন করে না, কিন্তু যেখানে যত্ন আছে, সেখানেই ফলের উৎকৃষ্টতা আছে। বীজ বা কলমে ইহার চারা জন্মে না। পুরাতন গাছের গোড়া, এবং ফলের উপর ও বোঁটা হইতে যে ফেঁকড়ী বাহির হয় তাহা জমীতে পুতিয়া দিলেই গাছ হয়। আনারস গাছের শিকড় মাটীর অধিক দূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, সুতরাং ইহার জন্য ভাসা মাটির আবশ্যক। গাঢ় ছায়াবিশিষ্ট স্থানে অনেকে আনারসের আবাদ করিয়া থাকেন, ইহাতে গাছ বড় বড় হয় এবং ফলও জন্মে, কিন্তু তাদৃশ সুমিষ্ট বা সুবাস যুক্ত হয় না। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক রুদ্ধ এবং ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে আনারসের আবাদ করিলে ফল অতি সুমিষ্ট ও সুবাসযুক্ত হয়।

যে স্থানে আনারসের আবাদ করা যায়, সে স্থান অতি অল্পদিন মধ্যেই সারহীন হইয়া পড়ে। অতএব অধিক দিন এক স্থানে ইহার আবাদ রাখিতে হইলে, প্রতিবৎসর সেই জমীতে সার দেওয়া আবশ্যক, অথবা প্রতি দুই বৎসর অন্তর ভিন্ন স্থানে ইহার আবাদ করিতে হইবে। পাতা-সার ও অস্থিচূর্ণ ইহার পক্ষে ভাল সার। পুরাতন গোবর-সার দিলেও চলিতে পারে।

বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার গাছ রোপণ করিবার বিশেষ সময়। অন্য সময়েও গাছ রোপণ করা চলিতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত সময়ে সচরাচর ইহার ফেঁকড়ী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাহা বর্ষার পূর্ব্বে বা মধ্যে জমীতে পুতিয়া দিতে পারিলে গাছগুলির শীঘ্রই শিকড়

বাহির হইয়া দিন দিন বাড়িতে থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল ফেঁকড়ী পাওয়া যায় তাহাদিগকে একবারে জমীতে না পুতিয়া, ছায়াবিশিষ্ট স্থানে আপাততঃ হাপোর দিয়া রাখিলে অল্পদিন মধ্যেই ইহার শিকড় বাহির হইবে। পরে যখন বর্ষারম্ভ হইবে, তখন উহাকে জমীতে স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে পারিলে অনেক সুবিধা আছে। শ্রাবণ মাসে ক্ষেত্রে দুই হাত অন্তর শ্রেণী মধ্যে দেড় হাত অন্তর এক একটী গাছ পুতিয়া দিতে হইবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মাটী কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসে সচরাচর গাছে ফল দেখা দেয়। তখন ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং গাছের গোড়ায় যে চারা বাহির হয়, তাহার দুই একটী রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে সতন্ত্র করিয়া লইয়া স্থানান্তরে পুতিয়া দিতে হইবে। গাছ অধিক ঘন হইলে উহার তেজ হ্রাস হয়।

গাছে সার দিতে হইলে, ফল ধরিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসেই দেওয়া উচিত। সচরাচর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া যে প্রণালীতে গাছে সার দেওয়া হইয়া থাকে, সেই প্রণালীতেই ইহাকেও সার দিতে হইবে। আনারসের পক্ষে গো-শালার আবর্জ্জনা প্রশস্ত।

ফলের শিরোভাগে যে গাছ জন্মে, তাহাকে অধিক বাড়িতে দিলে ফলের বিশিষ্ট অনিষ্ট হয়। ইহাতে ফল বাড়িতে বা সুপুষ্ট হইতে পারে না, অধিকন্তু ফলের মিষ্টতাও কমিয়া যায়।

ওদিকে ফলের মস্তক হইতে গাছটী কাটিয়া লইলে আঘ্রাণের বৈষম্য ঘটে। এজন্য ফার্মিঞ্জার (Firminger) সাহেব বলেন যে, সেই পাতাগুলি পিঁজিয়া দিয়া ফলের উপরে একখানি ইষ্টক বা টালি চাপা দিতে হয়। এরূপ করিলে আঘ্রাণ নষ্ট হইতে পারে না এবং ফলও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে।

কেমন স্থানীয় জলবায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ মুরসিদাবাদে আনারস অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। গাছ জন্মে ও বৰ্দ্ধিত হয় কিন্তু ফল অতি বিরল, এজন্য মুরসিদাবাদে আনারসের বিশেষ আদর। কলিকাতা অঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে যে চালান যায়, তাহাতেই তথাকার অধিবাসীগণ আনারস খাইতে পান। আঁট-মাটী ও লোনা হাওয়াতে আনারস ভাল জন্মে, কিন্তু উক্তস্থান এতদুভয় হইতেই বঞ্চিত, এইজন্য তথায় ইহা দুর্লভ সামগ্রী।

ডাক্তার লিণ্ডলী (Lindley) সাহেব বলেন যে, বিনা মৃত্তিকা সংশ্রবে উহা জীবিত থাকিতে পারে। এজন্য দক্ষিণ আমেরিকায় উদ্যান মধ্যে ইহাকে বারান্দা বা অন্য কোন স্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যাহা হউক, ইহা যে আর্দ্র বাতাসে ভাল থাকে তাহাতে সংশয় নাই, কারণ বাঙ্গালা দেশে ইহা যে পরিমাণে জন্মে, উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে তদ্রূপ হয় না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বাতাস শুষ্ক সুতরাং তথায় উহা অতি কষ্টে জন্মিয়া থাকে।

সচরাচর বাজারে বিক্রয়ার্থ যে সকল আনারস আইসে

তাহা যে তাদৃশ ভাল হয় না তাহার কারণ এই যে, উহার আবাদে লোকে বিশেষ যত্ন করে না। যত্ন পূর্ব্বক আবাদ করিলে দেশী আনারস অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে নানা স্থানের আনারস এদেশে জন্মিয়া থাকে কিন্তু সচরাচর ও সর্ব্বত্র তাহা পাওয়া যায় না। সিংহল দেশের আনারসের গাত্রে অতি অল্পই চোক থাকে এবং তাহার আস্বাদন অতি উপাদেয়। শিংঙ্গাপুরের আনারস গাছের পাতা অতিশয় মনোহর, এজন্ত অনেক সৌখীনের উদ্যানে উহাকে টবে রাখা হইয়া থাকে। কাশিপুর হর্টিকালচারল ইনষ্টিটিউশনে এই জাতীয় বিস্তর গাছ দেখা যায়।

কুইন (Queen) কেইন (Cayenne) প্রভৃতি জাতীয় আনারস অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইয়ুরোপে ইহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে জন্মান হইয়া থাকে। বিলাতে কাচের ঘরে (Hot-house) আনারস জন্মিয়া থাকে এবং তথায় ইহা একটী দুর্ল্লভ ফলমধ্যে গণ্য।

যত্ন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিলে আনারসের ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সুপক্ক আনারসে উৎকৃষ্ট চাট্‌নী ও অম্বল হইয়া থাকে। উহার পাতার রস কৃমি নাশক।

নারিকেল।

COCUS NUCIFERA.

COCOANUT.

ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নারিকেলের গুণের কথা অবগত আছেন। নারিকেলের কোন অংশই নষ্ট হয় না পরন্তু ইহার আবাদও বিশেষ ব্যয় বা শ্রমসম্ভব নহে। এই জন্য অনেকে নারিকেলের আবাদ করিয়া থাকে। নারিকেলের আবাদে বার্ষিক একটা স্থায়ী ও নির্দ্দিষ্ট আয়ও থাকে। এ জন্যও অনেক গৃহস্থ ইহার আবাদ করিয়া থাকেন।

নারিকেলের স্বাভাবিক জন্মস্থান ভারতীয় সমুদ্র উপকূল এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপ, সিংহল ইত্যাদি দ্বীপনিচয়। সমুদকূল হইতে যত দূর দেশে যাওয়া যায়, ততই সে সকল স্থানে উহার গাছ খর্ব্বাকৃতি, ফল ছোট ও সুস্বাদবিহীন হইতে দেখা যায়। সিংহল, সিঙ্গাপুর, মালয় মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের নারিকেল যত বড় ও সুমিষ্ট হয় বাঙ্গালা দেশে তেমন হয় না। আবার নিম্ন-বঙ্গে যাহা জন্মে, উচ্চ-বঙ্গ হইতে যতই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায় ততই নারিকেল গাছ কম দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানের জলবায়ু লবনাক্ত এবং মাটি বালি, এইরূপ স্থানেই, নারিকেল জন্মিয়া থাকে।

বেলে অপেক্ষা দো-আঁশ এবং দো-আঁশ অপেক্ষা এটেল মাটি নারিকেলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মুরসিদাবাদে

অবস্থানকালে রৈইসবাগে বিস্তর নারিকেলের চারা রোপণ করা গিয়াছিল। উক্ত বাগানের সাধারণ মাটীতে বালির ভাগ অধিক ছিল। বর্ষার কয়েক মাস গাছগুলি বেশ ছিল, কিন্তু যত উত্তাপ পড়িতে লাগিল ততই সেই বালি মাটী উত্তপ্ত হওয়ায় চারা গাছ মরিতে লাগিল। কিন্তু যে ভূমিখণ্ডে মাট-কলায়ের আবাদ করা হইয়াছিল, সেই ক্ষেত্রস্থিত নারিকেলের চারাগুলির বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ আমি যতদূর বুঝিয়াছিলাম তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ সকল চারার গোড়া মাঠ-কলাই গাছ দ্বারা আবৃত থাকায় মাটি অধিক উত্তপ্ত বা নীরস হইতে পারিত না, সুতরাং গাছেরও কোন অনিষ্ট হয় নাই। বেলে বা দো-অাঁশ মাটিতে রোপিত গাছগুলিকে ছুইদিন বৎসর বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে আর উহাদিগের মরিয়া যাইবার তত বিশেষ আশঙ্কা থাকে না।

নারিকেল গাছের পক্ষে অত্যুচ্চ ও নীরস জমী যেমন অনুপ-যোগী, ডোবা ও নীচু জমীও তদনুরূপ ক্ষতিজনক। বালির ভাগ অধিক এরূপ জমী স্বভাবতঃ নীরস হইয়া থাকে কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এইরূপ ভূমিতে নারিকেল গাছ রোপণ করিতে হইলে জমীতে পুষ্করিণীর পঙ্কিল মাটি সংযোজনা করা আবশ্যক। এই প্রকার জমীতে নারিকেল গাছ পুতিবার পূর্ব্বে তথায় কলা-গাছের আবাদ করিয়া রাখিলে মাটি সরস হইয়া থাকে, এবং সেই কলাগাছের এঁটে, পাতা প্রভৃতি পচিয়া গিয়া মাটির সহিত মিলিত হইয়া উহার দোষ অনেক পরিমাণে হ্রাস করে। নারি-

কেলের ক্ষেত্রে কলা বাগান থাকিলে আর একটী উপকার এই যে, নারিকেলের চারা-গাছ তাহার আশ্রয়ে ছায়া পাইয়া অতি অল্প দিন মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে পারে। এই প্রণালীতে নারিকেল গাছ রোপণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ যথাবিধি জমী তৈয়ার করিয়া দশ হাত অন্তর এক একটী কলার গাছ পুতিতে হইবে। কলা গাছ রোপণের এক বৎসর পরে সেই জমীতে প্রত্যেক দুই কলাগাছের মধ্যস্থলে নারিকেলের চারা রোপণ করিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যেই কলাগাছ ঝাড়বিশিষ্ট হইয়া উহাকে ছায়া প্রদান করিবার উপযোগী হয়। নারিকেলের সতন্ত্র ক্ষেত্র করিতে হইলে উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, কিন্তু যদি স্থানে স্থানে অথবা বেড়ার ধারে বা পুষ্করিণীর পা'ড়ে রোপণ করিতে হয়, তাহা হইলে নারিকেল চারার দুই পার্শ্বে দুইটী কলা গাছ থাকিলে ভাল হয়। বেলে মাটিতে নারিকেলের আবাদ করিতে হইলেই, যে কলা গাছ পুতিতে হয় তাহা নহে। যে কোনরূপ জমীই হউক, নারিকেলের ক্ষেত্রে উক্ত প্রণালীতে কলাগাছ রোপণ করিলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয় তাহাতে সংশয় নাই। নারিকেল গাছ বড় হইয়া ফলবান হইতে ৫।৭ বৎসর সময় লাগে। ইতিমধ্যে সেই কলাগাছে যে আয় হয়, তাহাতে নারিকেল গাছকে ঐ কয়েক বৎসর পালন করিয়াও উদ্যানস্বামীর লাভ থাকে। যখন দেখা যাইবে যে, কলা গাছের নিমিত্ত নারিকেল গাছের অসুবিধা হইতেছে, তখন প্রথমোক্ত গাছকে কাটিয়া দিলেই চলিবে

নারিকেলের ফল ভিন্ন অন্য কিছুতে চারা জন্মে না। সুপক্ক ও সুপুষ্ট ফলকে বর্ষারম্ভেই কোন ছায়াবিশিষ্ট স্থানে পাতো দিতে হয়। ফলের বোঁটার অংশ উপরে রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া দিবে। মাটি সর্ব্বদা ভিজা থাকিলে ২৫।৩০ দিনের মধ্যে উহার 'কল' নির্গত হয়। হাপোরে রোপণ-কালে ফলগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইলেও [illegible] ক্ষতি নাই, কারণ উহাদিগকে কিছুদিন পরেই স্থানান্তর করা আবশ্যক হইয়া থাকে। চারাগুলির তিনটী পাতা জন্মিলেই অন্য একটী হাপোরে ঈষৎ অন্তর করিয়া পুতিতে হইবে। বর্ষা মধ্যেই চারা স্থানান্তর করা উচিত। দুই বৎসরের কমে চারা ক্ষেত্রে বসা-বার উপযোগী হয় না। বড় চারার মূল্য অধিক বলিয়া অনেকে এক বৎসরের চারাই রোপণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তত ছোট চারাকে ক্ষেত্রে বসাইলে অনেক মরিয়া যায় এবং খরচা একই পড়িয়া থাকে।

জমীতে দশ হাত অন্তর নারিকেল গাছ পুতিতে হয়। চারা রোপণের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে একহাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে চারাটী সরল ভাবে বসাইবে। তদনন্তর মাটি দ্বারা গর্ত্ত উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া দিবে। মাটির সহিত লবন ও ছাই মিশাইয়া দিলে গাছে আর 'উইপোকা' ধরিতে পারে না,—পরন্তু গাছেরও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যেই জমীতে চারা

পুতিবার সময়। বর্ষার প্রথম ভাগে যাহাতে চারা রোপণ করিতে পারা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, কেন না তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্রই মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইয়া যায়। অন্য সময়ে রোপণ করিলে অধিকতর যত্নের আবশ্যক। অন্ততঃ দুই বৎসর কাল পর্যান্ত চারাগুলিকে বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে নিয়মিত-রূপে জল সেচন করা আবশ্যক। নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছ কঠিন-প্রাণ বলিয়া অনেকে তৎপ্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ অনেক গাছ মরিয়া যায়, অপর রুগ্ন হইয়া পড়ে। নারিকেল গাছের গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং প্রতিমাসে একবার করিয়া গোড়ায় মাটি কোপাইয়া দিবে।

তিন চারি বৎসর মধ্যে গাছের কাণ্ড মৃত্তিকার উপরে দেখা দেয় এবং ৫।৬ বৎসরে গাছে ফল ধরিয়া থাকে। গাছগুলি ক্ষেত্রে রোপণ করিবার দুই বৎসর পর্য্যন্ত উহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করা আবশ্যক। প্রতি বৎসর গাছের গোড়ায় পুষ্করিণীর পানা বা সেওলার সহিত লবন সংযুক্ত করিয়া দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং ফলও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি গাছে পাঁচ সের লবন দিলেই চলিবে এবং এই লবন নিকৃষ্ট জাতীয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। লবনের পরিবর্ত্তে সোরা ব্যবহারও প্রচলিত আছে।

গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইলে অথবা গাছে না ফল ধরিলে, উহার গাত্রে স্থানে স্থানে দুই তিনটী গর্ত্ত করিয়া দিলে, গাছে ফল ধরে। এই গর্ত্ত বা ছিদ্র কাণ্ডের দুই দিক ভেদ না

করে। গাছে এইরূপ গর্ত্ত করিয়া দিলে উহার তেজ কথঞ্চিৎ হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন গাছে ফল ধরিয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসে গাছের মস্তক হাল্‌কা ও পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। মস্তকের নিম্নভাগে অর্থাৎ কাণ্ডাংশের শেষ ভাগে যে সকল পুরাতন ও শুষ্ক পাতা এবং পুরাতন মোচ্‌ থাকে তাহা কাটিয়া দিবে এবং মস্তকোপরে কাক বা পক্ষীদিগের যদি বাসা থাকে তাহাও ভাঙ্গিয়া জঞ্জালাদি ফেলিয়া দিবে। এরূপ না করিলে গাছের মস্তকে অতিশয় ঠাণ্ডা লাগে এবং আবর্জ্জনাদি পচিয়া গিয়া উহা পোকা মাকড়ের আবাসস্থান হইয়া গাছের অনিষ্ট করে। যে সকল গাছের গোড়া মাটির উপরে দেখা যায়, তাহাদিগকে সারবান মাটী ও পূর্ব্বোল্লিখিত পুষ্করিণীজাত শেওলা দ্বারা মাঘ ফাল্গুন মাসে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিলে, গাছের গোড়া *ঠাণ্ডা থাকে এবং তাহাতে ফলের সংখ্যাধিক্য, আকার ও মিষ্টতা* বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এমন কোন কোন গাছ দেখা যায়, যাহাতে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জল বা শস্য অতি অল্প থাকে বা অনেক সময়ে থাকে না। এরূপ গাছকে 'ভুয়া' গাছ এবং ফলকে 'ভুয়া' ফল বলিয়া থাকে। যে গাছে এই প্রকার ফল জন্মে তাহার ডাব পাড়িয়া লওয়া উচিত, কারণ এ অবস্থায় সময়ে সময়ে শস্য ও জল পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই ডাব পাকিয়া গেলে উহাতে আদৌ কিছু থাকে না। যদি ডাব অবস্থাতেও উহা অব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে গাছে মোচ-

ফুলের কাঁদি বাহির হইলেই দুই তিন বৎসর একবারে কাটিয়া দেওয়া এবং গাছের বিশেষ তদ্বির করা আবশ্যক। এ প্রণালী অবলম্বন করিলে গাছের স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া সুফল প্রদান করিতে পারে।

গাছে নারিকেলকে ঝুনা হইতে দিলে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে, কিন্তু ডাব অবস্থায় ফল পাড়িয়া লইলে ফলন অধিক হয়, তাহার কারণ এই যে, ফল অধিক দিবস গাছে থাকিলে, উহাকে পোষণ করিবার জন্য গাছের যে শক্তি ব্যয়িত হয়, ডাব পাড়িয়া লইলে আর তত আবশ্যক না হইয়া বরং বৃক্ষ-শরীরমধ্যে তাহা সঞ্চিত থাকে, এবং পরবর্তী ফসলে তাহা কাজে আসিয়া থাকে। যাঁহারা ঝুনা নারিকেলের আবশ্যক বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে ডাব পাড়িয়া লওয়া ভাল।

নারিকেল গাছের কাণ্ডে কাট্-ঠোক্রা প্রভৃতি পক্ষীতে ছিদ্র করে। ইহাতে গাছের দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়া উহাকে ফলধারণের অনুপযোগী করে এবং অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। এজন্ত গাছে ঐ সকল পক্ষী বসিতে দেওয়া উচিত নহে। ইতি-পূর্ব্বে ছিদ্র করিয়া থাকিলে, তাহাতে গোবর ও মাটি দিয়া প্রলেপ দিবে এবং গর্ত্তের মধ্যে ঐ মাটি প্রবেশ করাইয়া দিবে। তদন-ন্তর উহার উপরিভাগে কয়েক খণ্ড বোতল ভাঙ্গা বা কাচের টুক্রা লাগাইয়া দিবে। এরূপ করিলে পুনরায় সেই গর্ত্তে আর পাখিতে ঢুক্রাইতে পারিবে না।

নারিকেলের অনেকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যে কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। এক প্রকার হরিদ্রা বর্ণের নারিকেল জন্মে, তাহাকে ব্রাহ্মণ-নারিকেল কহে। ইহার আকার মাঝারি রকমের হয়।

২য়। তাম্রবর্ণের যে নারিকেল হয়, তাহার আকার তাদৃশ বড় নহে। খাইতে মিষ্ট।

৩য়। কচি অবস্থায় সবুজবর্ণের এবং পাকিলে লালচে রং ধারণ করে। ইহাই সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয়।

৪। ছোট বেলের ন্যায় আকারের এক প্রকার নারিকেল হয়। যদিও উহা অতিশয় ক্ষুদ্র কিন্তু ডাবের অবস্থায় উহাতে প্রচুর জল থাকে। ইহাকে হাজারি-নারিকেল বলে। এক এক কাঁদিতে ৭০।৮০টী করিয়া ফল থাকে।

৫। সিংঙ্গাপুরে। এই নারিকেল চারি পাঁচ সের ওজনের হইয়া থাকে।

অনেকের মতে অন্যান্য অনেক গাছের মধ্যে নারিকেল গাছও বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির অন্তর্গত। এই জন্য নারিকেল গাছ ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে গণ্য। হিন্দুগণ এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ বলিয়া থাকেন যে, নারিকেল গাছ কাটিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শিয়া থাকে।

নারিকেল গাছের সকল অংশই প্রায় কাজে আসিয়া থাকে।

ফলের শস্য ও জল খাওয়া যায়। তৎপরে পক্ক ফলের শস্য হইতে তৈল নির্গত হয় এবং তাহাকে নারিকেল তৈল কহে। বাঙ্গালা দেশে সেই তৈল অনেক লোকে মাখিয়া থাকে, এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে ঐ তৈল ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নারিকেলের 'খোল' অর্থাৎ শস্যের যে আধার, তাহাতে হুঁকার খোল হয়। খোসা বা ছোবড়া হইতে যে দড়ি তৈয়ার হয় তাহাকে নারিকেল দড়ি কহে। ছোব্‌ড়াতে শয়নোপযোগী গদী ও তৈয়ার হয়। পাতায় যে কাটি থাকে তাহাতে ঝাটা হয়, এবং পত্রাংশ জালানী কার্য্যে ব্যবহার হয়।

নারিকেলের আবাদ হইতে একটা স্থায়ী আয় হইয়া থাকে। একবিঘা জমীতে ৬০ হইতে ৮০টী গাছ সুশৃঙ্খলে বসিতে পারে। সাধারণতঃ ইহার গাছ প্রতি একটাকা আয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অধুনাতন ইহার প্রতি লোকের যেরূপ হতাদর, তদ্বির ও পা'ট সম্বন্ধে অন্ততঃ, তাহাতে বৎসরে বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকা খরচ করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রণালিতে আবাদ করিলে বিঘা প্রতি ২৫।৩০ টাকা খরচ পড়িতে পারে, এবং তাহা হইলে উৎপন্নও অধিক পরিমাণে হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যদি ন্যূন কল্পে বিঘা প্রতি ৬০৲ টাকার ফল পাওয়া যায় এবং আবাদে ৩০৲ টাকা খরচ করা যায়, তাহা হইলেও ৩০৲ টাকা লাভ থাকে। তাহা ছাড়া, পাতা ও কাটি বিক্রয় করিয়া বৎসরে বিঘা প্রতি ৮।১০ টাকা আদায় হইতে পারে। উৎপন্নের পরিমাণ কম

এবং খরচের পরিমাণ অধিক ধরিলেও বিঘা প্রতি ৪০৲ টাকা প্রতিবৎসর আদায় হইতে পারে।

দাড়িম্ব।

POMEGRANATE.

দাড়িম্বের অপর নাম ডালিম বা বেদানা। ইহা রোগীর পথ্য এবং ভোগীর ভোজ্য। এই ফলের আবরণ বা খোসা শক্ত কিন্তু ভিতরের দানা অতি সুমিষ্ট ও সরস। ডালিম মেওয়া ফলের মধ্যে গণ্য।

আফগানিস্তান ও আরবদেশের বেদানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাঙ্গালা দেশ মধ্যে পাটনা অঞ্চলে যে ডালিম জন্মে, তাহাও ব্যবহার যোগ্য কিন্তু আধুনাতন যে সকল ফল নিম্ন-বঙ্গে জন্মে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহার কারণ এই যে, এদেশের মাটি ও জল বায়ু ইহার পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে।

ডালিম গাছের শিকড় ভাসা অর্থাৎ ইহার শিকড় মাটির ভিতর অধিক দুর প্রবেশ করে না, কিন্তু যথাবিধি পা'ট না করিলে সেই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। নিম্নবাঙ্গালার মাটি যেমন রসা, আব-হাওয়া তদ্রূপ সর্দ্দি-বিশিষ্ট। এই কারণে বাঙ্গালা দেশে উহার গাছের আকার বর্দ্ধিত হয় কিন্তু ফল সুমিষ্ট বা সুপুষ্ট হইতে পারে না। তবে বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছি, ফলের এই সকল দোষ কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকৃত করিতে

পারা যায়। নিম্ন-বঙ্গে ডালিম গাছ রোপণ করিতে হইলে প্রতি-গাছের জন্ত অন্ততঃ ৩।৪ বর্গ হস্ত ভূমির দুই হাত গভীর করিয়া মাটি উঠাইয়া ফেলিয়া সেই বিস্তৃত গর্ত্তমধ্যে টালি বিছাইয়া তাহার উপরে গাছ রোপণ করিলে, শিকড়গুলিতে তাদৃশ ঠাণ্ডা লাগিতে পায় না এবং উহা আর মাটির ভিতরে অধিক দূর প্রবেশ করিতে না পারিয়া উপরিভাগেই বিস্তৃত হইতে থাকে। বেহার বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মাটি অতিশয় নীরস এবং রৌদ্র অতি প্রখর, সুতরাং সে সকল দেশে কিঞ্চিদধিক মাটির ভিতরে টালি পাতিয়া দেওয়া আবশ্যক।

যে জমী বর্ষায় ডুবিয়া যায় অথবা অতিশয় ঠাণ্ডা, এরূপ স্থানে কোন মতে ডালিম গাছ রোপণ করা উচিত নহে। ঠাণ্ডা জমীতে ডালিম গাছ রোপণ করিলে গাছ কীটের আবাস হয়, তন্নিবন্ধন গাছ রুগ্ন হয় এবং ফলও কীটাক্রান্ত হয়।

গুটী, এবং বীজে দাবা ও জোড় কলমে ইহার চারা হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে ভাল জাতীয় ও সুপক্ক ফলের বীজ রোপণ করা উচিত। ভাল জাতীয় গাছ এদেশে লালিত পালিত হইয়া যে ফল প্রদান করে তাহার বীজও রোপণ করা উচিত নহে কেন না তাহাতেও গাছ খারাপ হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং যে সকল স্থানে ভাল ডালিম জন্মে তথাকার বীজ আনাইয়া রোপণ করিলে একবারে তত দূর নিকৃষ্ট পাইতে পারে না। বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিবার পূর্ব্বে উহার মূল শিকড়টি যত্ন ও সাবধানতায়

সহিত কাটিয়া গাছটীকে 'খাসি' করণান্তর রোপণ করিতে হয়। ইহাতে ফল অধিক হয়। জোড়-কলম করিবার জন্য যে বীজের চারা আবশ্যক হয়, তাহাকেও 'খাসি' করিয়া লইতে হয়।

প্রখর গ্রীষ্মকাল ব্যতীত যে কোন সময়েই জোড়-কলম করা যাইতে পারে, আর গুটী ও দাবা-কলমের পক্ষে বর্ষাকালই প্রশস্ত সময়। গাছের অবস্থা বুঝিয়া আষাঢ় মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত জমীতে গাছ পুতিতে পারা যায়।

ডালিম গাছের গোড়া হইতে ক্ষুদ্র ও সরু শাখা বা ফেঁকড়ী জন্মিয়া গাছের গোড়াকে ঘন ও আবৃত করিয়া ফেলে সুতরাং ঐ সকল ফেঁকড়ী জন্মিলেই উহাদিগকে সংহার করিয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করি[illegible] [illegible] ফলের অনিষ্ট সম্ভব হয়। গাছে শুষ্ক বা রুগ্ন শা[illegible] [illegible] কাটিয়া দিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ মাসে এক ফুট গভীর করিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় ১৫।২০ দিবস রাখিয়া সার মিশ্রিত মাটি [illegible] গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিবে। তদনন্তর সময়ে সময়ে গাছে জল সেচন করিতে হইবে। গাছে ফুল ধরিলে প্রচুররূপে জল সেচন আবশ্যক। সাধারণতঃ গোবর সারই প্রচলিত [illegible] উহার সহিত অর্দ্ধেক পরিমাণে পুরাতন রাবিসের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, উহাতে ফলের বিশেষ উপকার হয়। রেইসবাগে অনেক দিন হইতে

কয়েকটী বেদানা গাছ ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে কোনরূপ যত্ন না থাকায়, গাছগুলি নিতান্ত কৃশ ও কদর্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাহাতে অধিক ফল হইতই না এবং যাহা হইত তাহাও ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। কিন্তু এক বৎসর উহাদিগকে যত্ন করিয়া এবং গোবর মিশ্রিত সার দেওয়ায় কেবল যে গাছের অবস্থা উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাতে ফলও অধিক হইয়াছিল এবং তাহার দানা বা শস্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছিল। এইরূপ আরো দুই এক বৎসর তদ্বির করিলে ফলের যে আরো উন্নতি হইত তাহার কোন সংশয় নাই কিন্তু এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতঃ তথা হইতে আমি চলিয়া আসিয়াছি সুতরাং তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ তাহা বলিতে পারিলাম না।

গাছে ফুল ধরিলে উহাতে বিস্তর কীট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, বিশেষতঃ ছায়া বিশিষ্ট স্থানে যে গাছ জন্মে তাহার ফুলে অধিকতর কীট আশ্রয় লয়, এইজন্য ফাঁক জায়গায় গাছ রোপণ করা উচিত। ফুলের সময় মাঝে মাঝে গাছে ধোঁয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। যদি তাহাতে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে গাছে ফল আসিবার পরে এবং ফলগুলি ঈষৎ বড় হইলে সুতীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা ফলের মুখের ফুলটী কাটিয়া ফলটীকে কাপড় বা চট দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে। কঠিনরূপে বাঁধিলে ফল বাড়িতে পারে না, এজন্য কাপড় বা চট্ আল্গা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ফলের বাগানে ফলের জন্য ইহার যেমন আদর, ফুল-বাগানে শোভার জন্যও ইহা তদ্রূপ আদরণীয়। ইহার ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল

লালবর্ণ এবং এরূপ বর্ণ প্রায় অন্য ফুলে দেখা যায় না। তৎপরে ক্ষুদ্র ও চিক্কণ পত্র থাকায় গাছও দেখিতে অতি মনোহর।

আফগানিস্থানবাসীগণ প্রতি বৎসর শীতকালে তথা হইতে এই মেওয়া ফল ভারতবর্ষে বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। ইহার মধ্যে দুইটী জাতি আছে,—বেদানা ও মস্কট। বেদানার দানার বর্ণ লাল এবং অতি সুমিষ্ট, ও রসাল এবং বীজও অতি ক্ষুদ্র। মস্কটের দানা সাদা এবং শস্যের পরিমাণ ও মিষ্টতা অপেক্ষাকৃত অল্প।

আরব দেশের সামী ও তুর্কী জাতীয় বেদানা অতিশয় উৎকৃষ্ট। ক্যাপ্টেন বার্টন * বলেন যে, মক্কা (Mecca) ভিন্ন অপর কোন স্থানে সামীর তুল্য বেদনা দেখা যায় না। ইহার বহির্ভাগ লাল এবং খাইতে অতিশয় সুমিষ্ট। ইহার ফল একটী ছোট্ ছেলের মস্তকের ন্যায় বড় এবং সুগন্ধবিশিষ্ট ও প্রায় বীচি হীন। তুর্কী জাতির ফল বড় এবং সুমিষ্ট।

নাশপাতি।

PYRUS COMMUNIS.

PEAR.

নাশপাতি দেখিতে যেমন সুন্দর, খাইতেও তেমনি মুখরোচক। ইহা শীতপ্রধান দেশের ফল। কাবুল হইতে প্রতি-

*Firminger's Manual of Gardening.

বৎসর শীতকালে এদেশে বিস্তর নাশপাতি আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের গাছব্যবসায়ীগণ ইহার গাছ বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এতাবৎকালমধ্যে কুত্রাপি তাহার ফল হইতে শুনা যায় নাই। মুরশিদাবাদস্থিত•রেইসবাগের জন্য রামপুর হইতে কয়েকটী নাশপাতির গাছ আনয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তাহার শাখা প্রশাখায় আবশ্যক মত পাতাও জন্মে নাই। বলা বাহুল্য যে, যত্নের কোন প্রকার ত্রুটী হয় নাই। যে আট দশটী গাছ আনয়ন করা হইয়াছিল, দুই বৎসর মধ্যে কয়েকটী মরিয়া যায়, এবং অবশিষ্ট যে তিন চারিটী জীবিত ছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তর করিয়াও দেখিয়াছি, তথাপি তাহার অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। গাছগুলির শিরোভাগে অল্পমাত্র পত্র ছিল। নাশপাতির গাছে আমি বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম, সুতরাং ইহার বিষয়ে অধিক লিখিলাম না।

লেবু।

CITRUS.

Citrus Decumana ;—Pumelo. হিন্দি ভাষায় ইহাকে চকোত্রা এবং বাঙ্গালায় বাতাবী কহে। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রথমতঃ উহা এদেশে ব্যাটেভিয়া দেশ হইতে আনিত হয়। যাহা হউক, বাতাবি লেবুর সচরাচর দুইটী জাতি দেখা যায়,— একটীর ভিতরের বর্ণ হরিদ্রাভাযুক্ত শ্বেত, এবং অন্যটীর

গোলাপী। শুষ্ক ও দো-আঁশ অপেক্ষা রসা এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল জন্মে।

বীজ, গুটী ও দাবাকলমে ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকালেই চারা তৈয়ার করিবার সময়। ৬।৭ হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। অন্যান্য গাছের যেরূপ পাট হইয়া থাকে, তাহা হইতে ইহার বিশেষ পাট কিছু নাই, তবে চাষের তারতম্যানুসারে ফলের ইতর বিশেষ হয়।

পৌষ মাসের শেষভাগে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস শিকড় বাহির করিয়া রাখিয়া, পরে সার দিয়া তাহা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসে গাছে ফুল আইসে। ইহার ফুলের এমন সুগন্ধ যে, যে স্থানে উহা প্রস্ফুটিত হয় সেই স্থানের অনেক দূর ব্যাপিয়া আমোদিত হয়। ইহার ফুল শুভ্র বর্ণের, এবং থোলো থোলো হইয়া থাকে। সাহেবেরা ইহাকে Orange blossom কহেন এবং যথেষ্ট আদর করেন। ইঁহাদিগের বিবাহ-তোড়া (Bridal বা Wedding boquet) অর্থাৎ বিবাহের সময় যে ফুলের তোড়ার আবশ্যক হয়,—এই ফুলেও হইয়া থাকে।

ইহার ফল কাঁচা খাওয়া যায় না। শ্রাবণ মাস হইতে গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। গাছ হইতে ফল না পাড়িলে এক বৎসরের অধিক উহা গাছেই ঝুলিতে থাকে, কিন্তু পাকিয়া যাইবার পরে অধিক দিন গাছে থাকিলে ক্রমে নীরস হইয়া যায়।

মাঘ মাসে যখন গাছে ফল ধরে, তখন গাছের গোড়ায় লবণ দিলে ফল সুমিষ্ট ও বসাল হয়।

Citrus Japonica ;—Kamquat Orange. কাম্‌কোয়াট লেবু চীন দেশীয় ফল, কিন্তু এদেশে আজ কাল অনেক হইয়াছে। ফলের আকার শুপারির ন্যায়, আস্বাদন তীব্র অম্লাক্ত। অপরিব্যাপ্ত পরিমাণে ফলিয়া থাকে ও যখন পাকিয়া উঠে, তখন লাল ও হরিদ্রা মিশ্রিত বর্ণের হয় এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়া থাকে। অনেকে এই লেবুর গাছ টবে বা গাম্‌লায় রাখিয়া থাকেন এবং ফল হইলে মেলা ক্ষেত্রে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। টবে থাকিলে গাছগুলি দুই হাতের অধিক বড় হয় না কিন্তু জমীতে পুতিয়া দিলে চারি পাঁচ হাত উচ্চ হয় এবং গাছ ঝাড়াল হইয়া প্রচুর ফল ধারণ করে। চীন দেশের লোকে ইহাতে আচার তৈয়ার করে। কমলা জাতীয় লেবুর চারার সহিত ইহার জোড়-কলম করিতে হয়।

Citrus acida;—Lime. কাগ্‌জী, পাতি, গোড়া প্রভৃতি কয়েক প্রকার লেবু, একই জাতির অন্তর্গত এবং উহাদিগের আবাদ প্রণালী প্রায় একই রকম।

এই জাতির অন্তর্গত যে কয়েকটী লেবু আছে তৎসমুদায়ই টক্ বা অম্লাক্ত। আকার ও গুণবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাংসারিক ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ কাগ্‌জী ও পাতি লেবুর আবাদ হয়। এতদুভয়ই রোগীর ঔষধ, অরুচির রুচি এবং সৌখিনের আরামের জিনিষ, এজন্য ইহা-

দিগকে লোকে উদ্যানে স্থান দিয়া থাকে। অবশিষ্টগুলি তাদৃশ আবশ্যকীয় নহে বলিয়া সচরাচর কেহ রোপণ করে না।

এই জাতীয় লেবু গাছ বীজ, জোড়-কলম ও দাবাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চারা বা কলম উৎপন্ন করিবার সময় বর্ষাকাল। উদ্যানের সাধারণ জমীতেই ইহা জন্মে, কিন্তু যে জমীতে বালির ভাগ অধিক, তাহাপেক্ষা দো-আঁশ ও দুধে এঁটেল মাটিতে ভালরূপে জন্মে। এজন্য বেলে জাতীয় মাটি পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত প্রকারের রসা মাটি নির্ব্বাচন করিয়া ক্ষেত্র বা উদ্যান মধ্যে আট হাত অন্তর গাছ রোপণ করিতে হইবে। গাছ রোপণ-কালে মাটির সহিত পুরাতন রাবিশের গুঁড়া এবং সার মিশাল করিয়া দিলে উহার বিশেষ উপকার হয়। লেবু গাছ ঈষৎ হেলাইয়া পুতিলে বৃস্তৃতাকার ধারণ করে এবং তাহাতে প্রচুর ফল জন্মিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া উহার শিকড় বাহির করিয়া ১০।১৫ দিবস রাখিয়া, পরে যথা নিয়মে গোড়ায় সার ও মাটি দিতে হইবে। মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে। এই সময়ে গোড়ায় রসাভাব হইলে, ফুল ও ফল ঝরিয়া যায়, এজন্য সপ্তাহে একবার করিয়া জল সেচন করা বিশেষ আবশ্যক। বৈশাখ মাস হইতে লেবু ব্যবহার করিবার উপযোগী হয়। লেবুর আবাদ করিয়া বারমাস বাজারে উহার আমদানী রাখিতে পারিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। পাতি লেবুর রসে লাইম-জুশ (Lime Juice) নামক আরক প্রস্তুত হইয়া

থাকে। এই আরক অনেক রোগের ঔষধ। কলিকাতা সহরের খ্যাতনামা ডাক্তার রায় কানাইলাল দে বাহাদুর প্রতি বৎসর এই আরক তৈয়ার করিবার জন্য বিস্তর পাতি লেবু খরিদ করেন। এই জাতীয় কয়েকটী লেবুর বিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল ;—

পাতি। ইহা দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকার গোল এবং অন্য প্রকার বালিশের ন্যায় ঈষৎ লম্বা হয়। আস্বাদন টক।

কাগজী। আকার লম্বা ও প্রায় তিন ইঞ্চ বড় হয়। ইহাই সাধারণতঃ বিশেষ আদৃত।

গোঁড়া। পটলের ন্যায় গঠন কিন্তু দুই দিক তত সূক্ষ্ম নহে এবং বেষ্টনে স্থূলতর। অতিশয় টক্।

চীনে গোঁড়া। গোঁড়া লেবুরই জাতিবিশেষ, তবে উহাপেক্ষা ছোট হয়। ছাল পাতলা ও সুগন্ধযুক্ত।

কামরালি। বড় ও সুন্দর ফল। গোঁড়া লেবুর ধরণে গঠিত। ছাল মসৃণ।

টাবা। আকার গোল ও বৃহৎ হয়। খোসা কোমল।

কমলালেবু। Citrus Auratum ; Orange. ভারতবর্ষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কমলালেবু জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আসামের খাসিয়া-পাহাড় ও শ্রীহট্টে যে লেবু জন্মে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার খোসা যেমন পাতলা, আঘ্রাণ যেমন মনোহর আস্বাদনও তাদৃশ সুমিষ্ট। ইহার কোয়া

রসে পরিপূর্ণ এবং একটী লেবু খাইলেই প্রাণ যেন শীতল হইয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় ইহার রাশি রাশি আমদানী হয়। বড়দিন পর্ব্ব উপলক্ষে সাহেবদিগকে উপঢৌকন দিবার এবং আত্মীয় কুটুম্বদিগকে তত্ত্ব তাবাস করিবার ইহা একটী প্রধান অঙ্গ। এই সময়ে দারজিলিং অঞ্চল হইতেও অনেক লেবুর আমদানী হয়। চৈত্রও বৈশাখ মাসে নাগপুর হইতেও ঐ লেবু কলিকাতায় আসিয়া থাকে। দারজিলিং ও নাগপুর, উভয় স্থানের লেবুরই খোসা পুরু এবং রস অল্প। নাগপুরের লেবু সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। উহার খোসা পুরু ও ফাঁপা, রসহীন এবং আস্বাদ তত উৎকৃষ্ট নহে। উদ্যানমধ্যে সকল জাতীয় লেবু রাখিতে হইলে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলকেই স্থান দেওয়া উচিত। নাগপুরের সান্ত্বারা জাতীয় লেবু বৎসর মধ্যে দুই বার ফলে, একবার মাঘ মাসে, ও একবার আষাঢ় মাসে। দুইবার ফল ধারণ করিলে গাছ দুর্ব্বল হয় এবং ফলও পরিপুষ্ট বা মিষ্ট হয় না।

পাথুরে-চুন ও বেলে পাথরবিশিষ্ট জমী এবং সর্দ্দিময় হাওয়াবিশিষ্ট স্থানে উত্তমরূপে জন্মে। এ সকলই শ্রীহট্টে মিলে সুতরাং তথায় কমলাও ভাল জন্মে। যে স্থানে বৎসরমধ্যে একশত ইঞ্চি বা ততোধিক বৃষ্টি পড়ে, তাহাকে আমরা সর্দ্দিময় স্থান বলিয়া অর্থ করি। দারজিলিং ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ঐ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় সত্য, কিন্তু উহার শৈত্যাধিক্যবশতঃ লেবুর সেরূপ সুস্বাদ হয় না। নাগপুরেও বৃষ্টির অভাব আছে,

এজন্ত তথাকার লেবুও সেরূপ সুমিষ্ট বা সুডার হয় না। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে, যে সকল দেশে চা জন্মিয়া থাকে, কমলালেবুও তথায় জন্মে।

অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করিয়াও সুচারুরূপে উহার ফসল জন্মাইতে পারেন নাই। কোন কোন ধনী লোক নৌকা বোঝাই করিয়া শ্রীহট্ট হইতে মাটি আনাইয়া তাহাতে কমলার গাছ পুতিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ লেবু জন্মাইতে পারেন নাই। সকল ফলেরই একটা স্বাভাবিক জন্ম স্থান আছে এবং স্ব স্ব জন্মস্থানে তাহারা বিনা যত্নে উত্তম ফল ফুল প্রদান করিয়া থাকে, অথচ স্থানান্তরে গিয়া সহস্র যত্ন পাইলেও সেরূপ সুখানুভব করে না। তবে, সকল স্থানে যত্ন বিফল হয় না, সম্পূর্ণ না হইলেও কতক পরিমাণে সাফল্য লাভ হইয়া থাকে।

মুরসিদাবাদের হুমাউন-মঞ্জিল নামক বাগানে অনেক কমলালেবুর গাছ আছে। তাহাতে ফল হয় সত্য কিন্তু শ্রীহট্টের কমলার ন্যায় পুষ্ট ও আস্বাদনবিশিষ্ট হয় না এবং গাছের আকারও তেমন সুশ্রী নহে। বৈষ্টমবাগে নানাজাতীয় লেবুর গাছ রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাকার মাটি এত নীরস, (অন্ততঃ লেবুর পক্ষে) এবং হাওয়া এত শুষ্ক যে তথায় লেবুগাছ আদৌ সুশৃঙ্খলে জন্মিতে পারে না। অধিক কি দেশীয় কাগজী বা পাতিলেবুও তথায় ভাল হয় না।

যাহা হউক, ইহার গাছ রোপণ করিতে হইলে কলমের গাছই রোপণ করা ভাল। কলমের গাছও যখন স্থানান্তরে গিয়া

রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন বীজের গাছে যে ততোধিক হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? কমলালেবু যখন স্থানান্তরে গেলে স্বীয় প্রকৃতি ভুলিয়া যায়, তখন আমার মনে হয়, স্থানীয় পাতি বা কাগ্‌জী লেবুর সহিত প্রকৃত শ্রীহট্টের কমলার জোড় বাঁধিলে যে চারা উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য দেশে জন্মিতে এবং শ্রীহট্টের ন্যায় ফল প্রদান করিতে পারে।

আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জমীতে গাছ রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। রোপণ করিবার পূর্ব্বে দুই তিন হাত জমীর মাটী একহাত গভীর করিয়া খনন করত সেই মাটীর সহিত উত্তম সার মিশাইতে হইবে। তদনন্তর গর্ত্তমধ্যে কয়েক খণ্ড হাড়ের টুকরা সাজাইয়া তদুপরে গাছ বসাইয়া সেই মাটি দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিবে। গাছের গোড়ায় হাড় থাকিলে গাছ সবল হয় এবং ফল সুমিষ্ট হয়। গাছ পুঁতিবার পরে উহাকে অন্যান্য গাছের ন্যায় লালন পালন করিতে হইবে। এক প্রকার পোকায় উহার পাতা খাইয়া ফেলে এজন্য পাতার উপরে টার্পিন তৈলের ছিটা দিয়া রাখিলে পোকায় আর পাতা খাইতে পারে না।

আশ্বিন মাসের প্রথমভাগে দুই হাত ব্যাস ব্যাপিয়া গাছের গোড়া খুড়িয়া দিবে এবং গোড়ার মাটি তুলিয়া গাছের শিকড় বাহির করিয়া দিন পনর রাখিয়া দিতে হইবে। অনন্তর ঐ নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইলে মাটীর সহিত উক্ত ভেড়ী সার, মানুষের মলমূত্র বা গোমায়ুর সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাল করিয়া

গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। গাছে ফল ধরিলে যথেষ্ট পরিমাণে জল দিবে।

স্থানীয় জলবায়ু যেখানে ইহার অনুকূল, এরূপ স্থানেই কমলা-লেবুর আবাদ করা উচিত নতুবা প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া অর্থ বিষয়ে লাভবান হওয়া সুকঠিন। সখের বাগানে অর্থের বিবেচনা অতি সামান্য, সুতরাং সে স্থলে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই।

আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ইহার কলম বাঁধিবার সময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার জোড় বা চোক কলম করা উচিত। এতদুভয় প্রকার কলমের জন্য দেশী সাধারণ কমলার বীজোৎপন্ন চারা উপযোগী।

সপেটা।

ACHRAS SAPOTA.

দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণপ্রধান অংশে ইহার স্বাভাবিক জন্ম স্থান। এদেশে অতি অল্প বাগানে সপেটা গাছ দেখা যায়। সপেটা দুই প্রকারের দেখা যায়, এক গোল অপর ঈষৎ লম্বা। কিন্তু গোল জাতীয়ই সচরাচর দেখা যায়।

সপেটার গাছ বৃহৎ হয় এবং ইহার পাতাগুলি প্রায় লীচু পাতার ন্যায় এবং গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। ফলগুলির আকার ছোট গোল আলুর ন্যায় এবং বর্ণ কতবেলের ন্যায়। ভিতরের

শাঁসও কতবেলের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মিষ্ট ও রসযুক্ত। সাহেবেরা ইহা বড়ই ভাল বাসেন। সপেটা উত্তমরূপে না পাকিলে খাইতে সুস্বাদ হয় না।

খোলা ময়দান অপেক্ষা চারিদিক বৃক্ষাদি দ্বারা বেষ্টিত স্থানে সপেটার গাছ ভাল হয়। ইহার জন্য দো-অাঁশ মাটির আবশ্যক কিন্তু সকল প্রকার মাটিতেই জন্মে। দো-অাঁশ মাটির গাছের ফল অধিকতর সুস্বাদু হয়।

বীজে ও জোড়-কলমে চারা হয়। বীজের চারা ফলিতে অনেক বিলম্ব হয়। ক্ষীরণীর চারার সহিত ইহার জোড়-কলম বাঁধিতে হয়।

আষাঢ় মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহা ফলিয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন প্রকার পাট নাই। অপরাপর গাছকে যে নিয়মে আবাদ করা যায়, ইহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

লিচু।

NEPHELIUM LICHI.

চলিত ভাষায় ইহাকে নিচু কহিয়া থাকে। চীন দেশ ইহার আদি উৎপত্তি স্থান, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের উপযোগী ইহা একটী উৎকৃষ্ট ফল, সুতরাং সকল বাগানেই স্থান পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা মজঃফরপুরে যে লিচু জন্মে তাহা অধিকতর সুমিষ্ট, এবং স্থানীয়

জলবায়ু ও মাটির গুণে তথাকার ফল অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে।

লিচু গাছের পাতা ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং উহার বর্ণ ঘোর সবুজ। গাছের শাখা প্রশাখা ও পাতা অতি ঘনভাবে জন্মে এবং গাছগুলি দেখিতে বড় মনোহর, এজন্য উদ্যানমধ্যে উহা একটী অলঙ্কার বলিলেও চলে। আবার যখন থলো থলো ফল পাকিয়া উঠে, তখন যে গাছের কি মনোহর শ্রী হয় তাহা বর্ণনাতীত।

দো-আঁশ অপেক্ষা ঈষৎ এঁটেল মাটিতে উহা ভাল জন্মে।

গুটী ও দাবাতে ইহার কলম হইয়া থাকে। বীজেও চারা হয়, কিন্তু বীজগাছের ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে, এবং ফলিতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হয়, এইজন্য গুটী কলমেই সচরাচর কলম করা হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসে গুটী বাঁধিতে হয়। বর্ষার অভাব হইলে গুটীর উপরে কলসী ছিদ্র করিয়া ঝারা বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। গুটীকে কোনমতে শুষ্ক হইতে না দিলে একমাসের মধ্যেই উহা কাটিবার উপযোগী হয়। গুটী ভেদ করিয়া কলম হইতে শিকড় বাহির হইলে অনেকে তাহার উপরে দ্বিতীয়বার মাটি দিয়া দেয়, কিন্তু ভালরূপে যদি শিকড় বাহির হয় তাহা হইলে দ্বিতীয়বার মাটি দিবার আবশ্যক হয় না। দাবা-কলম করিলে তাহাকে সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখা উচিত। কলম তৈয়ার হইলে একবারে তাহাকে না কাটিয়া দুইবার 'ছেো' দিয়া পরে একবারে কাটিয়া লইলে কলমে অধিক কষ্ট পায় না।

বৈকালে কলম কাটিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য পুষ্করিণী বা জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পর দিবস ছায়াবিশিষ্ট হাপোরে পুতিয়া রাখিতে হয়। মুরসিদাবাদ অঞ্চলে হাপোরকে 'জখিরা' কহে। হাপোরে কলমগুলি পুতিবার অগ্রে গুটী স্থানের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া উচিত নতুবা গুটী কঠিন হইয়া থাকিলে শিকড় বাড়িতে পারে না। হাপোরে কলম বসাইবার পরে উহাদিগের আদৌ জলের না অভাব হয় এজন্য যখন তাহাতে জল দিবে তখন প্রচুররূপে দিবে। হাপোরে কিছু দিন থাকিয়া কলমগুলি সামলাইয়া উঠিলে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে সেই কলম পনর হাত অন্তর রোপণ করিবে। পূর্ব্ব বৎসরের কলম তৈয়ার থাকিলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই ক্ষেত্রে পুতিয়া দেওয়া উচিত, কেন না তাহা হইলে সম্মুখে বর্ষা পাইয়া গাছগুলি শীঘ্রই জমীতে লাগিয়া যায়। মাটিতে চারা পুতিবার সময় উহার সহিত ভাল সার মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। প্রথম দুই তিন বৎসর চারা গাছে নিয়মিতরূপে জল সেচন করা উচিত। কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া কোপাইয়া পৌষ মাসে গাছের গোড়ায় সার দিতে হইবে, কিন্তু এ সময়ে গাছে ছেঁচ দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে গাছে শীঘ্র মুকুল আসিবে না এবং অনেক সময়ে আইসেও না। পৌষ মাঘ মাসে গাছে মুকুল ধরে এবং সেই মুকুল যখন ফলে পরিণত হইবে তখন লিচুক্ষেত্রে মাসে দুই তিনবার উত্তমরূপে জল দিবে, এমন কি সমুদায় ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া দিবে। এই সময়ে গাছে রসের

অভাব হইলে ফল ঝরিয়া যায় এবং যে ফলগুলি গাছে থাকিয়া যায় তাহার বীচি বড় হয় ও শাঁস পাত্‌লা হয়। এ ছাড়া ফলে মিষ্টতাও থাকে না।

মুকুল ফলে পরিণত হইলে এবং ফলগুলি ঈষৎ বড় হইলে গাছগুলি জাল দিয়া ঘেরিয়া না দিলে কাক ও অন্যান্য অনেক পক্ষীতে ফল নষ্ট করে। কাটবিড়াল ও ইন্দুরেও অনেক ফল নষ্ট করে, এজন্য লিচুর বাগানে ফল হইবার সময় সর্ব্বদা পাহারা দিতে হয়। কার্য্য সহজ করিবার জন্য ফলের সময়ে লোকে লিচু-বাগানে ফাটা বাঁশ বা টিনের শব্দ করে। এই আওয়াজের ভয়ে কোন জন্তু আর গাছের কাছে যাইতে ভরসা করে না। লিচু-ব্যবসায়ীগণ রাত্রিকালেও সেই স্থান আগুলাইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ মধ্যে লিচু পাকিয়া উঠে। পাকিলে উহার খোসা লালবর্ণ ধারণ করে।

আজকাল নিম্ন লিখিত কয়েক জাতীয় লিচু প্রচলিত আছে।

চীনে, মজফরপুরে, বোম্বাই ও সবুজা।

সবুজা লিচু পাকিলেও উহার বর্ণ সবুজ থাকে এবং উহা পাকিতে বিলম্ব হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত উহার পাকিবার সময়।

লিচু গাছের পাতায় এক প্রকার রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণ এই যে, পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে এক প্রকার লাল পদার্থ

জন্মে। ইহাতে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। দুই চারিটী পাতায় এই রোগ দেখা গেলে, সেই পাতাগুলি অচিরে নষ্ট ভাঙ্গিয়া দিলে সেই রোগ গাছময় ব্যাপিয়া পড়ে। ইহাতে গাছ খারাপ হয় এবং ফলে রোগ জন্মে।

লিচুর বীজগুলি এক্ষণে অনর্থক নষ্ট হয়, কিন্তু উহা ব্যবহারে আসিলে পয়সা হইতে পারে। লিচুর বীজে তৈল আছে। বীজ হইতে সেই তৈল নিষ্ক্রামন করিয়া লইলে, সেই তৈল দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে তাহাতে সংশয় নাই। তৎপরে যে খৈল অবশিষ্ট থাকে তাহা গবাদি পশুতে খাইতে পারে।

গোলাপ জাম।

EUGINIA JAMBOS.

ইংরাজিতে ইহাকে (Rose apple) কহে। সুপক্ক ফলের বর্ণ যেমন মনোহর গন্ধও তেমনি সুন্দর। ভাল ফল খাইবার সময় উত্তম গোলাপ জলের ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে। কাঁচা অবস্থার ফলে সবুজ রং থাকে কিন্তু উহা যত পরিপুষ্ট হইতে ও পাকিতে থাকে, ততই সেই বর্ণ দূর হইয়া গোলাপী বর্ণ ধারণ করে।

বাগানের সাধারণ জমীতেই গোলাপ জাম জন্মিয়া থাকে।

নীরস ও অতিশয় উচ্চ ভূমিতে উহা ভাল হয় না। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয় এবং গাছে ফল ধরিলে গোড়ায় সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে জল দিলে ফল সুপুষ্ট ও মিষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই প্রায় ইহার ফল শেষ হইয়া যায়। তখন ইহার গোড়া একবার কোপাইয়া দিলে বর্ষার জল পাইয়া গাছ সতেজ হইয়া উঠে।

গাছে ফল ধরিলে, ফলগুলিকে ছেড়া কাপড় বা চট দিয়া বাঁধিয়া দিলে উহার কোমলত্ব নষ্ট হয় না, অধিকন্তু আরো সরস ও সুগন্ধযুক্ত হয়।

গুটী কলমে ও বীজে ইহার চারা জন্মিয়া থাকে। বর্ষারম্ভেই গুটী বাঁধিতে হইবে। প্রতিনিয়ত বর্ষা পাইলে অথবা গুটী ভিজা থাকিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে কলম তৈয়ার হয়। বীজও এই সময় বপন করিতে হয়। বীজের চারা টাপোরে তৈয়ার করিয়া পরে ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে পুতিতে হয়। বীজের হউক বা কলমের হউক, বর্ষা থাকিতে অথবা কার্ত্তিক মাসের মধ্যে গাছ গুলিকে জমীতে বসাইতে হয়।

জামরুল।

EUGINIA ALBA.

গ্রীষ্মকালের উত্তাপের দিনে জামরুল খাইয়া বড় আরাম পাওয়া যায়। ভাল করিয়া আবাদ করিলে এক একটী ফল বড় মোওয়ার ন্যায় হইয়া থাকে এবং তাহা এতই রসপূর্ণ হয় যে, দুই একটী খাইলেই তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ইহাতে ফল হয়। ফল যে একবারেই হয় তাহা নহে। একদফা ফল হয়, সেই সঙ্গে আর এক দফা ফুল হয়, এইরূপে জামরুল গাছে কয় মাস অবিশ্রান্ত ফল হইয়া থাকে। থলো থলো সাদা ফল যখন গাছে ঝুলিতে থাকে তখন গাছের অপরূপ শোভা হয়। ফল যত দিন না সুপক্ক হয়, ততদিন উহাতে সবুজ রঙ্গের আভা থাকে, কিন্তু সুপক্ক হইলে উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ ধারণ:করে।

জামরুল গাছের বিশেষ কোন্ পাট নাই, তবে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গাছের তলায় লাঙ্গল এবং গোড়ায় সার দিলে গাছের উপকার হয়। ফলের সময়ে গোড়ায় জল দিলে ফল বড় হইয়া থাকে।

বীজ ও গুটী কলমে ইহার চারা হয়, কিন্তু সচরাচর লোকে গুটী কলমেই চারা করিয়া থাকে। বর্ষাকাল কলম বাঁধিবার সময়। ইহার কলম অতি শীঘ্র জন্মে এবং গাছ অল্প দিন

মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করে। কুড়ি হাত অন্তর গাছ রোপণ করিতে হয়।

জামরুলের অন্য এক জাতি আছে, তাহার ফলের বর্ণ লাল। কিন্তু খাইতে সাদা জামরুলের ন্যায় সুমিষ্ট নহে তবে সৌখীনগণ রকমের জন্য বাগানে পুতিয়া থাকেন। ইহার সমুদায় পাটই সাদা জামরুলের ন্যায়।

পীচ।

AMYGDALUS PERSICA.

পীচের ফল অতিশয় মুখরুচিকর হইলেও সাধারণতঃ ভারতবাসীগণের নিকট এখনও ইহার তাদৃশ আদর হয় নাই। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহার যথেষ্ট আবাদ হয়। সাহেবদিগের সখ ও চেষ্টায় এক্ষণে কতক বাগানে পীচ গাছ দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ইহা পাকিয়া থাকে। ফল অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে খাইতে তত আরাম বোধ হয় না, কিন্তু ডাঁসা অবস্থার কিছু পরে খাইলে বিশেষ আরাম লাভ হয়। পাকা ফলের অভ্যন্তর সিন্দূরের ন্যায় ঘোর লাল।

বীজ, জোড়কলম ও চোক-কলমে ইহার চারা জন্মিয়া থাকে। বীজের চারা বিলম্বে ফলে এবং ফলেরও পূর্ব্বতন স্বভাব পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। এই সকল কারণে লোকে ফলের জন্য ইহার বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করে না। বীজের চারা,

চোক-কলম ও জোড়-কলম বাঁধিতে আবশ্যক হয়। আষাঢ় মাসে ছায়াবিশিষ্ট স্থানে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে এক মাস কি দেড় মাস সময় লাগে। কিন্তু বীজগুলিকে যদি অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত ফাটাইয়া মাটিতে রোপণ করা যায়, তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যে উহা অঙ্কুরিত হয়। ইহার বীজের খোলা অতিশয় কঠিন, এইজন্য অঙ্কুরিত হইতে এত বিলম্ব হয়।

চারাগুলি ঈষৎ বড় ও বলিষ্ঠ হইলে তাহাদিগকে হাপোর হইতে তুলিয়া ছোট টবে বা অন্য হাপোরে পুতিয়া যথা নিয়মে লালনপালন করিবে। হাপোর হইতে চারা তুলিবার সময়ে উহাদিগের মূলশিকড় সাবধানতার সহিত কাটিয়া দিলে ভবিষ্যতে গাছ আর মৃত্তিকার নিম্নদেশে অধিকদূর শিকড় বিস্তারিত করিতে না পারিয়া উপরিভাগের সন্নিকটে থাকে। মাটির নিম্ন দিকে অধিকদূর শিকড় প্রবেশ করিলে গাছ লাম্বাভাব ধারণ করে এবং তাহাতে অধিক ফলও ধরে না। শিকড়ের নিম্ন দিকের গতিরোধ করিবার জন্য ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে গাছ রোপণকালে উহার মূল শিকড় কাটিয়া গাছের তলায় টালি বিস্তৃত করিয়া দিতে হয়। ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত জোড়-কলম ও চোক কলম বাঁধিবার সময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দুই কার্য্যের জন্য বীজের চারা আবশ্যক। চারাগুলির কাণ্ড,—অন্ততঃ কাণ্ডের

নিম্নাংশ সুপুষ্ট ও অৰ্দ্ধ পরিপক্ক না হইলে কলম করিবার সুবিধা পাওয়া যায় না। টব সমেত চারার সহিত যদি কলম বাঁধা যায়, তবে কলম তৈয়ার হইলে উহাকে কাটিয়া আনিয়া আপাততঃ কয়েক দিবস ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে। তদনন্তর কলমগুলি সাম্‌লাইয়া উঠিলে জমীতে রোপণ করিতে হইবে। টবের গাছে যদি চোক বসান যায় তাহা হইলে টবকে ছায়ায় রাখিতে হইবে এবং চোক ফুটিয়া শাখা বাহির হইলে এবং উহা কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ হইলে একবারে জমীতে পুতিয়া দিতে ক্ষতি নাই। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জমীতে গাছ পুতিবার প্রশস্ত সময়।

বর্ষাকাল অতিক্রম হইলে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে পীচ গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া দিতে হইবে। গাছের বয়ঃক্রম অনুসারে আধ হাত হইতে এক হাত পর্য্যন্ত গভীর করিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং মোটা মোটা শিকড়গুলি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মগুলি ও ছাঁটিয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় গাছগুলিকে দুই সপ্তাহ হইতে চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত রাখা আবশ্যক। অনন্তর গাছ হইতে পাতাগুলি আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িবে। অতঃপর পীচগাছের শাখা প্রশাখা ছাঁটিয়া দিবার সময়। শাখা প্রশাখা ছাঁটিবার একটী প্রণালী আছে। প্রণালী মত না ছাঁটিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ছাঁটিলে গাছগুলির যে কেবল আকার বিশ্রী হইয়া যায় তাহা নহে, উহাতে ফলনও কম হইয়া

থাকে। গাছ ছাঁটিবার পূর্ব্বে তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সচরাচর লোকে সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আপন ইচ্ছামত গাছের অঙ্গে অস্ত্রচালনা করিয়া থাকেন। গাছের ভাবি আকার, গাছের উপস্থিত তেজ এবং গাছের ফলন, এই তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সকল গাছকেই নিজের ইচ্ছামত আকারে পরিণত করিতে পারা যায়, এই জন্য যেরূপ আকারে গাছকে পরিণত করিলে গাছের অনিষ্ট না হয় অথচ উহার শ্রী সম্পন্ন হইয়া ফল প্রদান ও উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করে তাহাই করা উচিত। কেহ গাছকে মন্দিরের ন্যায়, কেহ বা গম্বুজের ন্যায়, আবার কেহ বা বিস্তৃত আকারের করিতে পছন্দ করেন। যে আকারে করিতে হইবে সেই সেই আকারে উহার শাখা প্রশাখা ছাঁটিয়া দিতে হইবে। প্রথমতঃ শুষ্ক ও রুগ্ন শাখা সমুদায় কাটিয়া ফেলিবে। তদনন্তর অপরাপর শাখা সমুদায়ের অর্দ্ধ পরিপক্ক স্থান অবধি রাখিয়া উপরাংশ কাটিয়া দিবে এবং দেখিবে যে ভবিষ্যতে যে শাখা প্রশাখা নির্গত হইবে, তাহা যেন পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া গাছকে ঘন না করিয়া ফেলে।

গাছ যদি রুগ্ন হয়, তবে তাহাকে অধিক পরিমাণে ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ অল্প শক্তি বশতঃ উহা অধিক সংখ্যক শাখা প্রশাখার পোষণোপযোগী রস সঞ্চয় করিতে পারে না।

সুপুষ্ট ও বলবান গাছকে অধিক পরিমাণে ছাঁটিয়া দিলে ফল বড় হয় কিন্তু পরিমাণে অল্প হয়; আর অল্প পরিমাণে ছাঁটিলে ফল অধিক হয় কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। এক্ষণে মূল সূত্র কয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত গাছ ছাঁটিতে হইবে।

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার তিন চারি সপ্তাহ মধ্যে উহাদিগকে ছাঁটিয়া দিয়া মাটীর সহিত সার মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়। পীচের পক্ষে খৈল, অস্থিচূর্ণ ও ভেড়ী-সার ইত্যাদি বিশেষ উপযোগী।

গাছে যাবৎ না ফল ধরে তাবৎ মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে তাহাতে জল সেচন করিবে, কিন্তু ফল ধরিলে উহার প্রচুর জলের আবশ্যক। জলের অভাব না হইলে ফল বড় ও সুমিষ্ট হয়। পীচ গাছ হইতে সময়ে সময়ে রস নির্গত হয় এবং উহা বায়ু ও আলোক সংস্পর্শে ঘন আটা হইয়া যায়। গাছের আটা নির্গত হওয়া একটী রোগবিশেষ। যখন গাছে এইরূপ আটা নির্গত হইতে দেখা যাইবে, তখন তীক্ষ্ণ ছুরী দ্বারা সেই স্থানের আটা পরিষ্কার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে তথায় একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র কীটের আবাস জানিয়া সেই স্থানটী কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে যদি অসুবিধা হয় কিম্বা গাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম মুখ বিশিষ্ট পিচ্‌কারি দ্বারা উহার মধ্যে জল দিতে হইবে। এই জল উত্তপ্ত হওয়া আবশ্যক। উহার সহিত তামাকের জল

বা সাবানের জল মিশাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। এইরূপে বারম্বার পিচ্‌কারি দিলে গর্ত্তমধ্যস্থিত পোকাটী মরিয়া গিয়া বাহিরে আসিবে। তখন ঐস্থানে একটী কাষ্ঠের পিন্‌ বা প্যানা মারিয়া উপরে আল্‌কাতারা মাখাইয়া দিতে হয়।

গাছে ফলগুলি ঈষৎ বড় বড় হইলে কাপড় বা চট্‌ দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহাতে ফলের আকার বড় হয় এবং আস্বাদ কোমল ও সুস্বাদ হয়।

বিশেষ যত্ন করিয়া পীচের আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। ইয়ুরোপীয়গণ ইহার বড়ই পক্ষপাতী।

আজকাল এদেশে অনেক জাতীয় পীচের আমদানী হইয়াছে, তন্মধ্যে ফ্ল্যাট চায়না (Flat China) জাতীয়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কলিকাতায় ফল ব্যব-সায়ী ও নর্সরীওয়ালাদিগের নিকট নানাজাতীয় পীচের চারা পাওয়া যায়। সাহারাণপুর কোম্পানীর বাগানেও অনেক জাতীয় পীচ পাওয়া যায়। ভাল ও উৎকৃষ্ট জাতীয় গাছ আনাইয়াও যদি তাহার উপযোগী চাষ না হয়, তাহা হইলে তাহাও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়।

কাঁটাল।

ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA.

কাঁটালকে ইংরাজিতে Jack fruit কহে। মলকসপুঞ্জ, সিংহল ও ভারতবর্ষ ইহার স্বাভাবিক জন্ম স্থান। খাজা ও নেয়ে, এই দুই জাতিতে কাঁটাল বিভক্ত। কচি কাঁটালকে এঁচোড় কহে এবং তাহা রন্ধন করিলে অতি উত্তম তর-কারি হয়।

বীজ পুতিয়া কাঁটালের চারা তৈয়ার করিতে হয়। প্রবাদ আছে যে, কাটালের চারা নাড়িয়া পুতিলে তাহার ফল ভুয়া হয় অর্থাৎ তাহার মধ্যে কোয়া জন্মে না। এই কারণে লোকে ইহার বীজ স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে পুতিয়া দিয়া থাকে। চারা নাড়িয়া পুতিলে ফল ভুয়া হয় ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব আছে। যাহা হউক, ইহার বীজ বপন করিবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত। সুপক্ক কাঁটালের কোয়ামধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ হউক বা চারা হউক, ক্ষেত্র মধ্যে দশ হাত অন্তর বপন করিয়া, গাছ গুলি চারি পাঁচ বৎসরের হইলে কিম্বা গাছে গাছে ঘেঁসাঘেঁসি হইবার উপক্রম হইলে, প্রতি তিনটী গাছের মধ্যস্থিত একটী গাছ কাটিয়া দেওয়া উচিত্। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত কয়েক বৎসর মধ্যবর্ত্তি স্থান বৃথা পতিত না থাকে। ইতিমধ্যে গাছগুলি বাড়িয়া যায় এবং তখন তাহা জ্বালানী কাষ্ঠ-রূপে গৃহস্থের সংসারে ব্যবহৃত হইতে পারে। যাঁহারা এরূপ সাত্রয়

করিতে না চাহেন, তাঁহারা ২০।২৫ হাত অন্তর একবারে স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে গাছ পুতিতে পারেন। বীজ হইতে চারা তৈয়ার করিবার আর যে দুইটী প্রণালী আছে তাহা অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিলাম। সদ্য কাঁটাল পুতিয়া যে চারা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা সুপক্ক হওয়া চাই। তৎপরে ক্ষেত্রমধ্যে যে স্থানে স্থায়ীরূপে গাছ থাকিবে, তথায় সদ্য একটীকাঁটালের আয়তন মত গর্ত্ত করিয়া, বোঁটা উপরে রাখিয়া কাঁটালটী উত্তমরূপে পুতিয়া দিতে হয়। পাছে শৃগাল বা অপর কোন জন্তুতে উহা খাইয়া ফেলে, এইজন্য ৪। ৫ দিবস সেইস্থান আগুলিতে হইবে। চারি পাঁচ দিবস পরে যখন বোধ হইবে যে কাঁটালটী পচিয়াছে, তখন সেই কাঁটালের বোঁটাটী ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু সাবধান, যেন কাঁটাল পর্য্যন্ত না উঠিয়া আইসে। বোঁটা সমেত 'ভুতি' উঠিয়া আসিলে কাঁটালের মধ্যে একটী লম্বা গর্ত্ত হয়। সেই গর্ত্তের মধ্য দিয়া কাঁটালের মধ্যস্থিত যাবতীয় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তখন সেই চারা গুলিকে পাট, কলার-ছোটা বা অন্য কোন নরম দড়ি দিয়া সাবধানে বাঁধিয়া দিলে, কিছুদিন মধ্যে চারাগুলি পরপর জুড়িয়া গিয়া একটী গাছে পরিণত হয়। এই গাছ খুব তেজাল হয় এবং তাহাতে শীঘ্রই ফল ধরে।*

অন্য এক প্রথামতে যথানিয়মে প্রথমতঃ বীজ রোপণ করিতে হয়। অনন্তর বীজটী মধ্যে রাখিয়া দুই বা আড়াইহাত লম্বা একটী বাঁশের নল মাটিতে পুতিয়া, নলের মধ্যে অল্প মাটি দিবে।

* কৃষিতত্ত্ব ও ভারত-বন্ধু, ফাল্গুন, সন ১৩০১ সাল।

দুই তিন হাত লম্বা গাঁটহীন বাঁশ পাওয়া যায় না, এজন্য ঐ পরিমাণের বাঁশখণ্ড লইয়া ও তাহাকে চিরিয়া উহার অভ্যন্তরের গাঁটগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। তখন সেই দুই খণ্ড বাঁশ বীজের উপর চাকা দিয়া খণ্ডদ্বয়কে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়। বীজ কয়েক দিবসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় এবং গাছটী নলের মধ্য দিয়া উপরে উঠে। যখন গাছটী নল ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে দেখা যাইবে, তখন নলটী তুলিয়া লইয়া গাছটীকে শোয়াইয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর সেই গাছটীকে চক্রাকারে ঘুরাইয়া, কেবল মাত্র গাছের শিরোভাগ উপরে রাখিয়া মাটি চাপা দিবে। গাছটী আপন স্বভাবে যেমন বাড়িতে থাকিবে সেই সঙ্গে পাক দেওয়া কাণ্ডটীও বাড়িতে থাকিবে। এই গাছে পাঁচ বৎসরেই ফল ধরিয়া থাকে এবং ঘুর্ণীকৃত কাণ্ডে যে ফল জন্মে, তাহা অতি মিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ফলের সংখ্যাও অধিক হইয়া থাকে।*

কাঁটালের ভুতুড়িই উহার সার, এজন্য বীজ পুতিবার সময় উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ভুতুড়ি দিলে চারা তেজাল হয়। কাঁটালের বীজের অধিক দিন উৎপাদিকা শক্তি থাকে না, এজন্য কাঁটাল হইতে বীজ বাহির করিয়া লইয়া রোপণ করিতে অধিক দিন বিলম্ব করা উচিত নহে।

কাঁটালের জন্য দো-আঁশ মাটিবিশিষ্ট উচ্চ জমীর প্রয়োজন।

* Firmingers Manual of Gardening.

বর্ষাকালে যে স্থানে জল দাঁড়ায় এরূপ স্থানে আদৌ উহা রোপণ করা উচিত নহে। গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায়।

পাঁচ বৎসরের কমে গাছে কাঁটাল ফলিতে দেওয়া উচিত নহে। গাছ পুতিয়া অল্প দিন মধ্যেই ফলভোগ করিতে সকলই ইচ্ছা করেন, কিন্তু অল্পবয়স্ক গাছে ফল হইতে দিলে গাছ শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে কাঁটালক্ষেত্রে হলচালনা করিয়া, পরে প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার দিতে হয়। কাঁটালের পক্ষে খৈল সার প্রশস্ত। গাছ বেশ তেজাল থাকিলে কোন সার দিবার আবশ্যক করে না, বরং দিলে গাছের ফল ফাটিয়া যায় এবং তাহাতে ফলের কোমলত্ব ও মিষ্ট আঘ্রাণ নষ্ট হয়। গাছে যদি ফল ফাটিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে গাছকে নিস্তেজ করিবার জন্য উহার গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া বাজে শিকড় কতকগুলি কাটিয়া দিলে ফল আর ফাটে না। বর্ষাকালে ঐরূপে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া রাখিলে তাহাতে জল জমিতে পারে এবং তাহাতে গাছ মরিয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে সুতরাং সে সময়ে যদি ফল ফাটিতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে গাছের গায়ে স্থানে স্থানে অস্ত্রাঘাত করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারে। অস্ত্রাঘাতদ্বারা গাছের গাত্র দিয়া অনেক রস বাহির হইয়া যায় ও তাহাতে উহার তেজ হ্রাস হইয়া থাকে। আম্রের ন্যায় ইহার গাত্রে আব বা গাঁট জন্মিলে তাহা কাটিয়া দিতে হয়।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়। ইহার ফুলের সুগন্ধে স্থান আমোদিত হয়। বাস্তবিক ইহার ফুলের গন্ধ জহরী চাঁপার (Magnolia pumila) ন্যায়। মাটির ভিতরেও ইহার ফুল হয় ইহা জানিয়া রাখিবার বিষয়। পৌষমাস হইতে চৈত্র মাস পর্যান্ত এঁচোড় খাইবার সময়। বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কাটাল পাকিয়া থাকে। শাখা প্রশাখা অপেক্ষা মূল কাণ্ড বা গুঁড়িতে যে ফল জন্মে তাহা অধিক পুষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। আবার মাটির ভিতরে যে ফল জন্মে তাহা অধিকতর মিষ্ট ও পুষ্ট হয়। মাটির ভিতর কাঁটাল জন্মিলে প্রথমতঃ জানিতে পারিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু ফল পাকিলেই মাটির উপরি-ভাগ ফাটিয়া যায় এবং তাহার ভিতর হইতে সুগন্ধ ছুটিতে থাকে। তখন উহাকে মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া লইতে হয়।

শৃগাল ইহার পরম শত্রু। কাঁটাল পাকিলেই উহারা দলে দলে আসিয়া কাঁটাল চুরী করিয়া লইয়া যায়। অধিক কি, উহারা ক্বাধাকাঁধি করিয়া গাছে উঠে এবং ফল পাড়ে। এতদ্ব্যতীত চোরেও অনেক চুরী করে। কাঁটাল চুরীর ন্যায় অন্য কোন ফল চুরী সহজ নহে, কারণ ইহার গুঁড়িতে অনেক ফলে সুতরাং উহা পাড়িতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। যাহা হউক কাঁটাল রক্ষা করিবার জন্য গাছে ফল ধরিলেই গোড়া বেষ্টন করিয়া তালপাতা, কুলের কাঁটা প্রভৃতি উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়।

এক একটী গাছে ১৫০।২০০ কাঁটাল ফলিয়া থাকে। সুপক্ক

কাঁটালের আকার ও গুণ অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়। সচরাচর যে সকল কাঁটাল সাধারণ লোকে খাইয়া থাকে, তাহা শতকরা ১১৲। ১২৲ টাকায় বিক্রয় হয় এবং বড় ও ভাল জাতীয় ৩০৲। ৪০৲ টাকাতেও বিক্রয় হয়। ইহা পাইকারী দর। খুচরা দরে এক একটী বড় ও ভাল কাঁটাল একটাকা বা পাঁচ-সিকা দামে বিক্রয় হয়।

খাজা কাঁটালের গাত্র সহজ এবং পাকিলেও ঈষৎ সবুজ থাকে। উহার কোয়া চিবাইয়া খাইতে ভাল। নেয়ো কাঁটালের গাত্র কাঁটাবিশিষ্ট এবং পাকিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। ইহার কোয়া অতিশয় কোমল, রসপূর্ণ ও সুমিষ্ট। ঘন দুগ্ধ বা ক্ষীরের সহিত নেয়ো কাঁটালের রস অতি উপাদেয়। কাঁটাল অতি গুরুপাক ফল। অধিক খাইলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা। কাঁটাল খাইয়া ঈষৎ লবণ খাইলে উহা শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে।

কাঁটালের কলম হয় না। অনেকে অনেক রকম পরীক্ষা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমিও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন, বটগাছের সহিত উহার জোড় বাঁধিলে কলম হইতে পারে, আমি কিন্তু ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। সুতরাং নিজের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তবে পাঠকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এতদুভয়ে পরস্পর জোড় লাগিতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সংশয় আছে। কারণ দুইটী

সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর এবং পরস্পরের স্বভাব ও সংগঠনও সতন্ত্র। এরূপ স্থলে বট ও কাটালে জোড় লাগা একবারে অসঙ্গত।

কাঁটাল বীচি শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে এবং অসময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পোড়া, সিদ্ধ ও তরকারীতে যথেষ্ট ব্যবহার হয়। আমার মনে হয়, কাঁটাল বীচি পেষন করিয়া আটা প্রস্তুত করিলে দুর্ভিক্ষের দিনে অনেক কাজে লাগিতে পারে। তাহা ব্যতীত আরও মনে হয়, কাঁটাল বীচির গুঁড়া সাগু, আরোরুট ও বার্লির ন্যায় শিশু ও রোগীর আহার বা পথ্যে ব্যবহার হইলেও হইতে পারে। কাঁটালের বীচি অতি পুষ্টিকর, কিন্তু শেষোক্ত রূপে ব্যবহার হইতে পারে কি, না, তাহা চিকিৎসা-শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বলিতে পারেন। যদি গুরুপাক না হয় তবে কেন যে উহা ঐরূপে ব্যবহার হইতে পারে না তাহা বলিতে পারি না।

কাঁটালের কাষ্ঠ ঘন শিরাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল, দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং মূল্যবান। গাছ যত পুরাতন হয়, তত তাহা পাকিয়া থাকে এবং মজবুত হয়। ইহাতে বার্ণিশ মাখাইলে মেহগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হয়। কাঁটাল কাঠে টেবিল, চেয়ার, বাক্স, সিন্দুক, আলমারি প্রভৃতি অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিলিম্বি।

AVERRHOA BILIMBI.

বিলিম্বি পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও মলক্কসের গাছ। দাক্ষিণাত্যেও বিস্তর জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে এই গাছ অতি অল্পই দেখা যায়, কিন্তু এক্ষণে অনেকে বাগানে রোপণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার গাছ প্রায় ৩০।৩৫ ফুট উচ্চ হয় এবং সেই পরিমাণে উহার কাণ্ডও স্থূল হইয়া থাকে। ফলগুলি তিন বা চারি ইঞ্চ পরিমাণ লম্বা হয়। তেলাকুচা ফলের ন্যায় উহার আকার বটে কিন্তু বর্ণ তত ঘন সবুজ নহে। সুপক্ক ফল অতি কোমল এবং সাদা জাতীয় আঙ্গুরের ন্যায় মসৃণ। কাঁচা ফলের আস্বাদন অতিশয় টক্‌, এজন্য অম্বল অথবা চাট্‌নী ভিন্ন অন্য কোনরূপে ব্যবহার করা অসম্ভব। সুপক্ক ফল খাইতে মাখনের ন্যায় নরম এবং আস্বাদ অম্ল-মধুর।

মাঘ মাসে গাছে থলো থলো ফল ধরে এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

সুপক্ক ফলের বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। বীজ বপন করিবার পক্ষে বৈশাখ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়। হাল্‌কা মাটীপূর্ণ গামলায় বীজ পুঁতিয়া যথানিয়মে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে। বীজ হইতে চারা জন্মিতে ২০।২৫ দিন সময় লাগে। চারাগুলি তিন চারি অঙ্গুলি বড় হইলে এক একটী ছোট টবে এক একটী করিয়া চারা পুঁতিয়া দিতে

হইবে অথবা হাপোরেও স্থানান্তর করিলে চলিতে পারে। গাছগুলি অন্ততঃ দুই বৎসরের না হইলে স্থায়ীরূপে জমীতে রোপণ করা উচিত নহে। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ছোট ছোট চারাগুলিকে এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যে, গায়ে ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে অথচ উত্তাপ ও বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে পাকে। ইহার পাট সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে সাধারণ নিয়মে তদ্বির করিলেই চলিবে।

লকেট।

ERIOBOTRYA JAPONICA.

LOQUAT.

চীন ও জাপান দেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও অনেক স্থানে জন্মে, কিন্তু নিম্ন-বঙ্গে যেরূপ সহজে ও প্রচুররূপে জন্মে, উচ্চ-বঙ্গে বা বেহার অঞ্চলে তদ্রূপ হয় না। কলিকাতা অঞ্চলে ইহা যেরূপ অধিক পরিমাণে ফলিয়া থাকে, মুরসিদাবাদে সেরূপ হয় না। লকেট ফল খাইতে মধুর এবং অতি মুখরোচক।

অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফুল ধরে। মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল পাকিবার সময়। ইহার অন্য কোন জাতি নাই, তবে পাটের তারতম্যানুসারে ফলের আকার ছোট বা বড় হয় এবং স্বাদেরও বিভিন্নতা হয়।

বীজ হইতে উহার চারা জন্মে। পুরাতন বীজে গাছ জন্মে না, এজন্য ফল হইতে বীজ সতন্ত্র করিবার অতি অল্প দিন মধ্যেই উহাকে মাটিতে বপন করা আবশ্যক। বীজোৎপন্ন গাছের ফলের ভালমন্দ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে, এজন্য জানা গাছের কলম করিয়া রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

পৌষ ও মাঘ মাসে গাছে যখন ফল থাকে, তখন গাছে প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ফল ছোট হয় এবং বীজ অধিক ও বড় হয়। তাহা ছাড়া তেমন রসাল বা সুমিষ্ট হয় না।

আমড়া।

SPONDIAS MANGIFERA

HOG-PLUM.

আমড়া অতি উপাদেয় ফল না হইলেও বাগানে দুই একটী রাখিতে ক্ষতি নাই। ইহাতে অম্বল রন্ধন করিয়া লোকে খাইয়া থাকে। বাগানের কোন নিভৃত অংশে আমড়া গাছ রোপণ করা উচিত, কারণ শীতকালে ইহার সমুদায় পাতা পড়িয়া গিয়া বাগানের শ্রী নষ্ট করে।

বীজে ইহার চারা উৎপন্ন হয়। গাছের বিশেষ পাট করিতে হয় না, কারণ ইহা যেখানে সেখানে আপনা হইতেই

জন্মিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে ফল হয় এবং ভাদ্র, আশ্বিন মাসে তাহা পাকিয়া থাকে।

বিলাতি আম্‌ড়া।

SPONDIAS DULCIS.

ওটেহীট এবং ফ্রেণ্ডলী দ্বীপে ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান, কিন্তু এক্ষণে এদেশে অনেক জন্মিয়াছে। ইহার পাকা ফল অতি মুখপ্রিয়। রন্ধন করিয়া যে অম্বল হয়, তাহাও মন্দ লাগে না। সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ অতি মনোহর।

আম্‌ড়ার চারার সহিত ইহার কলম বাঁধিলে চারা উৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়া বীজেও চারা জন্মিয়া থাকে। সময়ে সময়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া এবং মাটি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কোন পাট নাই। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জমীতে গাছ রোপণ করিবার সময়।

কামরাঙ্গা।

AVERRHOA CARAMBOLA.

কলিকাতার অনেক বাগানে কামরাঙ্গা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গাছের পাতা ছোট ছোট এবং গাছ ঘন পত্র বিশিষ্ট বলিয়া বাগানের শ্রীবৃদ্ধিকারক। ইহার ফুলের বর্ণ

ছুদে-গোলাপী। ফলের আকার লম্বা ও পল বা খাঁজবিশিষ্ট। সুপক্ক ফলের আঘ্রাণ মিষ্ট। কাঁচা ফল অতিশয় টক্ কিন্তু পাকিলে অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়া থাকে।

বীজ ও গুটী কলমে ইহার চারা জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে গাছ রোপণ করিবার সময়। দো-আঁশ মাটিবিশিষ্ট উচ্চ জমীতে ইহা ভাল জন্মে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে গাছের গোড়া কোপাইয়া দিবে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

ইহার অন্য এক জাতির নাম 'চীনে কামরাঙ্গা'। দেশী হইতে ইহার ফল ছোট এবং পাকা ফলের বর্ণ ঘন সবুজ। দেশী কামরাঙ্গায় অম্লভাগ অধিক থাকে কিন্তু ইহা তত টক্ নহে বরং মিষ্ট কিন্তু উহার ন্যায় সদ্গন্ধ বিশিষ্ট নহে। দেশীর সহিত ইহার জোড় বাঁধিলে কলম হইয়া থাকে। বর্ষাকালে গাছ রোপণ করিতে হয়।

বেল।

ÆGLE MARMELOS.

বেল গাছ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র। ইহার পত্রে দেবসেবা হয়। স্থান বিশেষে ইহার ফলের আকার ছোট বা বড় হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও দো-আঁশ মাটীতে যে গাছ জন্মে তাহার ফল বড় হয়। মুরসিদাবাদে বেলের আকার বড় হইয়া

থাকে। বেল ওজনে অর্দ্ধ পোয়া হইতে আড়াই সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বড় অপেক্ষা মধ্যমাকার বেলের আস্বাদন ভাল।

দো-আঁশ মাটির সহিত পাতা-সার মিশ্রিত করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে হাপোর করিয়া বর্ষাকালে বীজ পাতো দিতে হয়। চারাগুলি একহাত পরিমাণে উচ্চ হইলে স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। দো-আঁশ গভীর মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। গাছের গোড়ায় আগাছা জঙ্গল জন্মিলে অথবা কাণ্ডে ছোট ছোট শাখা জন্মিলে কাটিয়া দেওয়া উচিত। গোড়ায় জঙ্গল থাকিলে অথবা কাণ্ডে ঐরূপ সরু ফেঁকড়ী থাকিলে গাছের অবস্থা ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে যে ফল জন্মে তাহার আস্বাদন মন্দ হয়, আকার ছোট হয়। গাছের গোড়ায় যে সকল ফেঁকড়ী জন্মে, তাহা শিকড় সমেত উঠাইয়া লইতে পারিলে চারা গাছ হইতে পারে।

যে বেলের মধ্যে শাঁস অধিক এবং বীজ ও আটা কম তাহাই ভাল ফল। গ্রীষ্মকালে ইহার সরবত অতি উপাদেয় হয়। বিসূচিকা প্রভৃতি অনেক রোগে বেল আহার ও ঔষধের কার্য্য করে। মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ইহার ফল পাকিবার সময়।

কথবেল।

FERONIA ELEPHANTUM.

এ দেশে ইহা জঙ্গলের গাছ মধ্যে গণ্য কিন্তু ইহার সুপক্ব অম্লমধুর ফল অতিশয় মুখপ্রিয়। ইহাতে অতি উপাদেয় চাট্‌নী হইয়া থাকে। কথবেলের আকার প্রায় গোল, খোলা বা আবরণ শক্ত ও খসখসে এবং বর্ণ ধুসর। মাঘ ফাল্গুন মাসে গাছে ফল ধরে এবং ভাদ্র মাস নাগাএদ পাকিতে আরম্ভ হয়। পাটের বিশেষ নিয়ম নাই। বীজে ইহার চারা জন্মে। বর্ষাকাল বীজ বপনের সময়।

চাল্‌তা।

DILLINIA SPECIOSA.

চাল্‌তা গাছের আকার বৃহৎ এবং পাতাগুলি প্রায় নয় ইঞ্চ লম্বা ও চারি পাঁচ ইঞ্চ চওড়া হয়। গাছ দেখিতে শোভাময়। চাল্‌তা নামে যে ফল ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা ফল নহে, বীজ গর্ভের আবরণ মাত্র। ইহার ফুল অতিশয় শুভ্রবর্ণের এবং তাহার আকার ৬ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট। গাছে ফুল ফুটিলে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। ফলের জন্য না হইলেও শোভার জন্যও এ গাছ উদ্যানে রাখা যাইতে পারে।

কচি অবস্থায় ইহাতে অম্বল হয়, তখন তাদৃশ টক্‌রস থাকে না, কিন্তু পাকিলে অতিশয় টক্ হয়, তখন উহার সহিত মিষ্ট না

দিলে খাওয়া সুকঠিন। চিনি সংযুক্ত চাল্‌তার অম্বল অতিশয় তৃপ্তিজনক। পাকা চাল্‌তার সুন্দর আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। আচার প্রস্তুত করিবার প্রণালী গৃহস্থ মহিলাগণ ভালরূপই জানেন, এজন্ত আমরা আর সে বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিব না।

আষাঢ় মাসে গাছে ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া থাকে। বাগানের সাধারণ জমীতেই চাল্‌তা গাছ রোপণ করিলেই চলিবে। বীজ হইতে চারা জন্মে।

আতা।

ANONA SQUAMOSA.

CUSTARD APPLE.

আতা গাছের আদিম বাসস্থান এসিয়া কি আমেরিকা খণ্ডে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। নানা যুক্তি দ্বারা সেণ্ট হিলেয়ার (St. Hilaire) সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইহার স্বাভাবিক জন্মস্থান এসিয়া। কিন্তু ডাক্তার ভইট (Dr. Voigt) বলেন ইহা আমেরিকার গাছ *। ডাক্তার এণ্ডারসন সাহেব সেণ্ট হিলেয়ারের মত পোষণ করেন। যাহা হউক, বাঙ্গালা দেশে ইহা বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ে প্রচুর জন্মে।

আতা গাছ ৬।৭ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ফল

---

* Dr. Voigt's Hortus Suburbanus Calcuttensis.

গুলি দেখিতে অতি মনোহর এবং আস্বাদ ততোধিক। সুপক্ক আতার ন্যায় আর কোন সুমিষ্ট ফল আছে কিনা সন্দেহ। ইহা খাইতে যেমন সুমিষ্ট, সরস ও কোমল, তেমনি উহার আঘ্রাণও মধুর। সুপক্ক ফলের শাঁস এতই নরম ও আল্‌গা যে হাতে করিয়া তুলিতে গেলে পড়িয়া যায়।

সুপক্ক ফলের গাছ হইতে চারা উৎপন্ন হয়। গাছ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া ফল ধারণোপযোগী হয়। চারি বৎসরেই গাছে ফল ধরে। বর্ষাকালে বীজ পাতো দিয়া যথা নিয়মে চারা উৎপন্ন করিয়া, পরবৎসর বর্ষাকালে স্থায়ীরূপে জমীতে রোপণ করিতে হইবে। সাধারণ দো-আঁশ মাটিতে গাছ পুঁতিতে হইবে। ফল হইয়া গেলে গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। যত দিন না প্রথম ফলন হয়, ততদিন গাছ ছাঁটা উচিত নহে। শীত কালে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া পুরাতন গোবর সার দিতে হয়। ফসলের সময় গাছে জল সেচন করিতে পারিলে ফল ভাল হয়।

কাক, পক্ষী, কাটবিড়াল প্রভৃতি অনেক জন্তুতে ইহার ফল নষ্ট করে। এজন্য ফলনের সময়ে গাছে জাল চাপা দেওয়া উচিত কিম্বা চট্ বা কাপড় দ্বারা প্রত্যেক ফল বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

সাহেবগঞ্জের পাহাড়ে স্বভাবতঃ বিস্তর আতা গাছ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

নোনা।

ANONA RETICULATA.

BULLUCK'S HEART.

হিন্দিতে ইহাকে রাম ফল কহে। প্রকৃতপক্ষে নোনা আতার জাতিবিশেষ, কিন্তু আস্বাদন ও আঘ্রাণে আতা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। নোনার আকারও প্রায় আতার ন্যায় কিন্তু উহার গাত্র সহজ অর্থাৎ আতার ন্যায় খাঁজবিশিষ্ট বা বন্ধুর নহে।

বীজেই ইহার চারা জন্মে। বিশেষ কোন পাট করিবার আবশ্যক হয় না, তবে সময়ে সময়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং মাটি কোপাইয়া দেওয়া উচিত। নোনা গাছের ছাল জলে ভিজাইয়া কাচিলে সূত্র বাহির হয়। এই সূত্র বেশ মজবুদ এবং ইহাতে কাগজ তৈয়ারি হয় ও বেড়া বাঁধিবার উপযোগী দড়ি প্রস্তুত হয়।

ফলগুলি পাকিবার সময় আগত হইলে, গাছে জাল দেওয়া ভাল, কেননা তাহা হইলে কাক, পক্ষী, বাদুড় বা কাটবিড়াল আর ফল নষ্ট করিতে পারে না।

দেশী কুল।
ZIZYPHUS VULGARIS.
PLUM.

দেশী-কুলের অপভ্রংশ কথা দিশি-কুল। ইহার দুইটী জাতি দেখা যায়,—একজাতির আকার গোল এবং অন্য জাতির ঈষৎ লম্বা। স্থান ও পাটের বিশেষত্ব হেতু উহার আস্বাদন স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। দেশী-কুলে অম্লরসের প্রাধান্য অধিক। অযত্ন-পালিত গাছের ফল ছোট হয় এবং তাহার আস্বাদন যে কেবল টক্ হয় তাহা নহে, উহা একেবারেই রসনার অপ্রিয় হইয়া থাকে।

সাধারণ দো-আঁশ মাটিতেই কুল গাছ জন্মে। বীজ ও চোঙ্গ-কলমে ইহার চারা হয়। বীজোৎপন্ন চারার স্বভাব অতিশয় শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এইজন্য গাছের স্বভাব ঠিক রাখিবার জন্য কলম করা আবশ্যক।

বর্ষাকালে যথানিয়মে কোন স্থানে বীজ পাতো দিয়া চাব উৎপন্ন করিতে হয়। চারাগুলি অন্ততঃ দুই বৎসরের হইলে তাহাতে জোড় বাঁধিতে অথবা চোঙ্গ বসাইতে হয়। কুলগাছের মূল কাণ্ড ও গোড়া হইতে অনেক কেঁকড়ি বাহির হয়, এজন্য চারা গাছের গোড়া ঘেঁসিয়া জোড় বাঁধিতে অথবা চোঙ্গ বসাইতে হইবে। জোড় বা চোঙ্গের নিম্নাংশ হইতে কাণ্ডে যে শাখা প্রশাখা জন্মিবে তাহা কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত চোক ও চোঙ্গ কলম

বাঁধিবার উপযুক্ত সময় এবং জোড় কলম আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বাঁধা যাইতে পারে।

কুলের ক্ষেত করিতে হইলে ১০।১২ হাত অন্তর এক একটী গাছ পুতিতে হয়। গাছ যতদিন না মাটির সহিত উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, ততদিন উহাতে যথা নিয়মে জল সেচন করা আবশ্যক। চারি বৎসরের মধ্যেই গাছে ফল ধরে। ফল শেষ হইয়া গেলে গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। মূলকাণ্ডটী রাখিয়া যাবতীয় শাখা কাটিয়া দেওয়াই রীতি। এরূপ করিলে গাছে নূতন শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া উত্তম ফল ধারণ করে, কিন্তু গাছ না ছাঁটিয়া দিলে ফলন অতিশয় কম হয়। এই সময় হইতে যাবৎ না বর্ষাগত হয় তাবৎ গাছে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে। কার্ত্তিক মাসে গাছের আকার অনুসারে দুই হাত হইতে চারিহাত ব্যাপিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিবে এবং ২০।২৫ দিবস গাছের গোড়া খুলিয়া রাখিয়া পুনরায় মাটি চাপা দিবে। এই সময়ে মাটির সহিত সার মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। পুষ্করিণীর মাটি দিলেও চলিতে পারে।

লম্বা ও গোল ফলের গাছ চিনিবার সহজ উপায় পাতা দৃষ্টে। লম্বা ফলের গাছের পাতা ঈষৎ লম্বা এবং গোল জাতির পাতা গোলাকারপ্রায় হয়।

বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কুল আকারে বড় হয় এবং তাহা খাইতেও সুস্বাদু। পশ্চিমে কুলের সাধারণ নাম কাশী কুল। ইহার ফল বড় উত্তম।

নারিকেলী কুল।

ZIZYHHUS JUJUBA.

দেশী কুলের ন্যায় নারিকেলী কুলের পাট ও অন্যান্য কার্য্য সমান, তবে ফসলের সময়ের বিভিন্নতা হেতু পাট করিবায় সতন্ত্র সময় আছে। বর্ষাকালে গাছে ফুল হয় এবং শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষভাগ হইতে ফল খাইবার উপযোগী হয়। সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের গোড়া কোপাইয়া সার দিতে হয়।

যে যে উপায়ে দেশীয় কুলের চারা উৎপন্ন করা গিয়া থাকে ইহার পক্ষেও তাহাই। চোক, চোঙ্গ বা জোড় কলম করিতে হইলে দেশীয় কুলের চারার সহিত বাধিতে হয়।

নারিকেলী কুলের আবাদ লাভজনক। সাহেব ও দেশীয় লোকে সকলেই ইহার আদর করেন। ইহা কুড়ি দরে বিক্রয় হয়। বাজারে এক আনা দামে ইহার প্রতি কুড়ি বিক্রয় হইয়া থাকে।

আঙ্গুর।

VITIS VINIFERA.
"
GRAPE.

ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাজাতীয় আঙ্গুর জন্মিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে কিস্‌মিস্‌, মনকা, হোঁসানী ও মস্কা নামক

কাশ্মীরের কয়েকটী জাতীয় আঙ্গুর অতিশয় উৎকৃষ্ট। আরঙ্গাবাদে একজাতীয় আঙ্গুর জন্মে, তাহার ফলের বর্ণ কাল কিন্তু খাইতে অতি সুস্বাদু ভিতরের বর্ণ পিত্তের ন্যায়। দৌলতাবাদে ইহার প্রভূত চাষ হইয়া থাকে এবং নানাদেশে বিক্রয়ার্থ চালান হয়। আফগানিস্থানে প্রচুর আঙ্গুর জন্মে এবং তথাকার ব্যবসায়ীগণ শীতকালে ভারতে তাহা বিক্রয়ার্থ আনিয়া থাকে। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশের গাছ এদেশে ভাল জন্মে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় অনেক দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় আঙ্গুর জন্মে এবং এক্ষণে ভারতের অনেক স্থানে তাহা জন্মিতেছে। কিন্তু ইহার স্বভাব এতই কোমল যে একদেশ হইতে অন্যদেশে লইয়া গেলে উহার পূর্ব্বের স্বভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

আঙ্গুরের গাছ লতানিয়া। লতা গাছ জাফরী বা মাচায় উঠিয়া প্রতি শাখা প্রশাখায় থলো থলো ফল ধারণ করে। সমস্ত দিবস যে স্থানে রৌদ্র থাকে এরূপ স্থান অপেক্ষা, যে স্থানে বৈকালে ঈষৎ ছায়া পড়ে, এরূপ স্থানে আঙ্গুর গাছ রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভারতের সকল স্থানের জল বায়ু সমান নহে সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ফলে বিশেষত্বঃ আছে,—কোথাও ভাল আবার কোথাও মন্দ হয়। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলের আঙ্গুরের যেরূপ আস্বাদন, পূর্ব্ব বঙ্গ বা আসামজাত ফলে তদ্রূপ হয় না, তাহার কারণ শেষোক্ত স্থানের আব-ওয়া নিতান্ত সর্দ্দিময়। সর্দ্দিময় স্থানের আঙ্গুর

সুপক্ক হইতে পারে না এবং তাহা অম্লাস্বাদনবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ও আসাম দেশে যেমন উৎকৃষ্ট ফল জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ দাক্ষিণাত্যেও সহজে জন্মে না।

আঙ্গুরের জন্য হাল্‌কা ও দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট উচ্চ জমীই প্রশস্ত। বর্ষাকালে জমীতে কোনমতে জল দাঁড়াইতে না পারে এজন্য সর্ব্বাগ্রে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, পরে মৃত্তিকা সংস্কারে হস্তক্ষেপন করা উচিত। মাটি নিতান্ত চটচটে বা আটা-যুক্ত হইলে উহাতে সার মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। জমী উত্তমরূপে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া পরে তাহাতে লাঙ্গল ও মই দিতে হইবে এবং মাটিতে যে সকল ইট, খোলা বা জঙ্গলের শিকড়াদি থাকিবে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে সার দিতে হইবে। গাছ অনেক অন্তর করিয়া রোপণ করিতে হয়, এজন্য সমুদায় ক্ষেত্রে না দিয়া নিয়মিত পরিমাণ স্থান ব্যবধানে অর্থাৎ যে যে স্থানে গাছ পুতিতে হইবে সেই খানেই সার দিলে চলিবে।

আঙ্গুরের পক্ষে পচা খৈল, পুরাতন গোময়, গলিত আবর্জ্জনা, অস্থিচূর্ণ এবং সোরা সতন্ত্র ভাবে বা কয়েকটী একত্র মিশ্রিত করিয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট। পচা মাছ, মৃত প্রাণী, কষাইখানার রক্ত প্রভৃতিও আঙ্গুরের উৎকৃষ্ট সার। সার ইতিপূর্ব্বে উত্তমরূপে পচাইয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত, নতুবা গাছে পোকা লাগিতে পারে।

আঙ্গুর গাছে প্রচুর জল আবশ্যক করে। অতএব যাহাতে

উহার ক্ষেত্রে সেঁচ চলিতে পারে এজন্য পয়নালা কাটিয়া রাখা আবশ্যক। আর যেখানে দুই চারিটী গাছ রোপণ করিতে হইবে, তথায় পয়নালার পরিবর্ত্তে গাছের গোড়ায় থালা বা মাদা করিয়া দেওয়া উচিত। পয়নালা হউক আর মাদা হউক, বর্ষারম্ভে তাহাতে মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নতুবা গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া গাছকে মারিয়া ফেলে।

খোঁচা বা কাটি (Cutting) কলমে সহজেই আঙ্গুরের চারা জন্মিয়া থাকে। এই কলমের জন্য সুপুষ্ট, নীরোগ ও অর্দ্ধপক্ক বা পূর্ব্ব বৎসরের শাখা নির্ব্বাচন করতঃ দুই তিনটী চোক বা গাঁট সমেত এক একটী কটিং কাটিতে হইবে। বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে কটীং রোপণ করিতে হয়। ঈষৎ ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোর করা যুক্তিসঙ্গত। এই হাপোরের মাটিতে কিঞ্চিৎ চরের বালি মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে অল্প-দিন মধ্যেই কলমে শিকড় জন্মিয়া থাকে। হাপোর মধ্যে নয় ইঞ্চ ব্যবধানে এক একটী কলম পুতিতে হইবে। এই কলম পর বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে স্থায়ীরূপে রোপণ করিতে পারা যায়। দাবা কলমেও চারা হয়। বর্ষাকালে দাবা করিতে হয়।

জমীতে ৮ হাত অন্তর গাছ রোপণ করিতে হইবে। যে স্থানে গাছ রোপণ করিতে হইবে সে স্থানটী একহাত গভীর করিয়া খনন করতঃ উহার মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই মাটির সহিত সার মিসাইয়া কলমটী পুতিয়া দিবে এবং

মধ্যে মধ্যে গাছের আবশুক বুঝিয়া জল সেচন করিবে। পীচ গাছ রোপণ করিবার সময় যেমন উহার তলায় টালি পাতিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, আঙ্গুর গাছ রোপণ করিবার সময় ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে উহার শিকড় মৃত্তিকাভ্যন্তরে অধিক দূর প্রবেশ করিতে না পারিয়া উপরিভাগেই থাকে। ইহাতে স্বভাবতঃই অধিক ফল ফলিয়া থাকে। তাহা ছাড়া অতি সহজে উহাদিগের পাট করা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার গাছ লতানিয়া সুতরাং তাহার অবলম্বনের জন্ত জাফরী বা মাচা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছে যত শাখা প্রশাখা জন্মিবে, তাহাদিগকে যত্ন সহকারে মাচায় সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। মাচায় উঠিয়া শাখা প্রশাখায় পরস্পর না জড়াইয়া যায়, এজন্ত সময়ে সময়ে গাছের ডগাগুলি এদিক সেদিকে সরাইয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়।

বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে যে, সময়ে পীচ, গোলাপ প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়, সেই সময়ে ইহারও গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় বাহির করিয়া মাসাবধি এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপ কিছু দিবস শিকড় বাহির করা থাকিলে, গাছের পাতাগুলি আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়া যায়। এইবার গাছটীকে ছাঁটিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য গাছ ছাঁটিবার জন্য যে নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে

ইহার পক্ষেও তাহাই। রুগ্ন ও শীর্ণ শাখাগুলি একবারে কাটিয়া ফেলিয়া, দিতে হয় এবং যে সকল শাখায় ফল হইয়াছিল এবং বিগত বৎসরের শাখা সকল অল্প পরিমাণে ছাঁটিয়া দিতে হয়। প্রতি শাখার দুই কি তিনটী মাত্র গাঁট রাখিয়া উপরি ভাগ কাটিয়া দেওয়া নিয়ম। নূতন শাখা প্রশাখাগুলি এক-বারে কাটিয়া ফেলিয়া গাছকে পাতলা করিয়া দিবে। পরে গাছে নূতন শাখা প্রশাখা বাহির হইলে তাহাদিগকেও। ঈষৎ পরিমাণে ছাঁটিয়া দিতে হয়। কিন্তু এই নূতন শাখা সকলকে যদি না ছাঁটিয়া স্বভাবতঃ বাড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে গাছে প্রচুর ফল জন্মে বটে, কিন্তু তাহা অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া গাছও দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। অযত্ন-রক্ষিত গাছ সকল এইরূপে খারাপ হইয়া যায়। সখ করিয়া অনেকে উদ্যানে ইহা রোপণ করেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত তদ্বির না করায় উহা অল্পদিন মধ্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

যদি কোন গাছ হতাদর হেতু শ্রীহীন, ঘন ও রুগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে উত্তমরূপে ছাঁটিয়া পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আবশ্যক বুঝিলে কেবল মাত্র কাণ্ডের অল্পাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায় শাখা প্রশাখা কাটিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতি না হইয়া, উহাতে নূতন শাখা নির্গত হইয়া গাছ সুশ্রী ও ফলবতী হইবে। ইহাতে প্রথম বৎসর ফল হইবে না।

গাছে অধিক শাখা প্রশাখা থাকিলে ফল বড় হইতে পারে না, এজন্য রুগ্ন, শীর্ণ ও অনাবশ্যকীয় ডালগুলি একেবারে কাটা আবশ্যক। প্রতি শাখায় একটী কিম্বা দুইটী ফলের থলো থাকিতে দিলে ফল বড় হয়। গাছটী যত পুরাতন হইতে থাকিবে তত তাহার পুরাতন শাখাগুলি ক্রমে কাটিয়া দিতে হইবে এবং তাহা হইলে নূতন শাখায় ক্রমশঃ ফল ধরিতে থাকিবে। একই শাখা প্রশাখায় পুনঃ পুনঃ ফল ধারণ করিতে দিলে ফল ত বড় বা অধিক হয় না বরং গাছটী অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এক প্রকার কীট আঙ্গুর গাছের বিষম শত্রু। ইহারা একবার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সমুদায় আঙ্গুর গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। গাছ এইরূপে কীটাক্রান্ত হইলে গাছটীকে একবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দেওয়া এবং সেই কীটাক্রান্ত কর্ত্তিত গাছটীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

আঙ্গুরের গাছ ৭।৮ বৎসর ভালরকম ফল প্রদান করে এবং তাহার পরে ক্রমশঃ উহা ক্ষীণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, অতএব অবিশ্রান্ত ফল পাইতে হইলে প্রথমবারের রোপিত গাছগুলি ৪।৫ বৎসরের হইলে দ্বিতীয় বার গাছ রোপণ করিলে প্রথমবারের গাছ মরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয়বারের গাছ ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে।

মুরসিদাবাদে V. A. Mirza'র বাটীতে একটী আঙ্গুরের গাছ অদ্যাপি আছে এবং তাহাতে প্রতিবৎসরই ফল হইয়া থাকে। ইহার ফল খাইতে মন্দ নহে। গাছে যখন ফল ধরে

তখন দেখিতে অতি মনোহর। প্রতি থলোয় ২০ হইতে ৫০।৬০ টী ফল হইতে দেখা গিয়াছে। গাছটীর প্রতি যেম সাহেবের বিশেষ যত্ন ছিল সুতরাং তাহা বেশ সুপুষ্ট ও তেজাল হইয়াছিল এবং আশানুরূপ ফলও প্রদান করিত।

সাহারানপুর কোম্পানীর বাগানে, লক্ষ্ণৌ সোসাইটীর বাগানে এবং অনেক গাছব্যবসায়ীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আঙ্গুরের গাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন স্থান বিশেষে কোন জাতীয় আঙ্গুর ভাল জন্মে, এজন্য উদ্যানস্বামীগণ সেই স্থানের আবহাওয়া বুঝিয়া সেই জাতিয় গাছ রোপণ করিতে পারিলে অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

মাদার।

ARTOCARPUS LACOOCHA.

দেশ বিশেষে মাদারকে 'ডেও' বা ডেফল কহে। বাঙ্গালা দেশে ইহা সহজেই জন্মিয়া থাকে। ফলের আকার প্রায় গোল কিন্তু অসমতল। কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজবর্ণ থাকে এবং পাকিলে ফিকে আলতাবর্ণ ধারণ করে। আস্বাদন অম্ল-মধুর এবং মুখরোচক। ফলন অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু লোকে ইহাকে তাদৃশ আদর করে না, সুতরাং গাছের অধিকাংশ ফলই তলায় পড়িয়া নষ্ট হয়।

বীজ হইতে চারা জন্মিয়া থাকে এবং বর্ষাকালে বীজ পুতিতে হয়। সচরাচর বৃক্ষাদি পালনের যাহা নিয়ম, ইহার জন্য

তদ্ব্যতীত অধিক বা স্বতন্ত্র কিছু নাই। পৌষ বা মাঘ মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং আবশ্যক বোধ করিলে সেই সময়ে উহাতে সার দিতে পারা যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে গাছে জল সেচন করিলে ফলের আকার বড়, এবং আস্বাদন মিষ্ট ও রসাল হয়।

ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে গাছে ফুল ধরে এবং বর্ষাকালে ফল পাকিয়া থাকে। গাছে এবং কাঁচা ফলে অত্যন্ত চট্‌চটে আটা থাকে। আটার বর্ণ দুগ্ধবৎ সাদা।

তেঁতুল।

TAMARINDUS INDICA.

শুদ্ধ ভাষায় তেঁতুলকে তিন্তিড়ী কহে এবং সাহেব লোকে Tamarind কহে।

যত্ন করিয়া বাগান মধ্যে তেঁতুল গাছ পুতিতে কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। যেখানে সেখানে বীজ পড়িলেই আপনা হইতে গাছ জন্মে। গভীর ও এঁটেল মাটিতে ইহা ভাল থাকে। এই গাছের হাওয়া অত্যন্ত দূষিত, এজন্য বসত-বাটীতে আদৌ রোপণ করা উচিত নহে। তেঁতুল গাছের কেহ বড় একটা কোন পাট করে না, কিন্তু যথানিয়মে পাট করিলে ফলে অধিক শাঁস জন্মে এবং তাহা মিষ্ট হয়। মৃত্তিকা ও যত্নের তারতম্যানুসারে ফলের আস্বাদে ইতর বিশেষ হয়।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গাছে ফুল ধরে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

তেঁতুলের অন্য এক জাতি আছে এবং তাহাকে লাল-তেঁতুল কহে। শেষোক্ত তেঁতুলের খোসা লাল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উভয় তেঁতুলে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

ইহার বীজ পেষন করিলে তৈল নির্গত হয়। উহা জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফল্‌সা।

GREWIA ASIATICA.

ইহার ফল অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বীচি বড় ও শাঁস অল্প, এই জন্য ইহার বিশেষ আদর নাই, কিন্তু ফলের স্বাদ অম্ল-মধুর ও মুখরোচক। চেষ্টা ও যত্ন করিয়া শাঁসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বীজের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট করিতে পারা যায়। বীজে ও গুটীতে চারা জন্মে। গ্রীষ্মকালে ফল পাকিয়া থাকে। ইহার ফলের সরবত্‌ অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

ব্রেড-ফ্রুট।

BREAD-FRUIT.

ARTOCARPUS INCISUS.

'ব্রেড ফ্রুট' শব্দটী ইংরাজি এবং ফলও বিদেশী, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় ইহার কোন নাম নাই। কিন্তু নর্শরিওয়ালারা সাধারণের কৌতুহল উদ্দীপনের জন্ত হউক বা ইহার একটী বাঙ্গালা নাম হওয়া আবশ্যক মনে করিয়াই হউক, 'ব্রেড-ফ্রুট' শব্দের তর্জ্জমা করিয়াছেন 'রুটি-ফল'। তর্জ্জমা ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তি, বস্তু, বৃক্ষলতা বা স্থান বিশেষের নাম তর্জ্জমা করায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি না হইয়া বরং একটা বিভ্রাট ঘটে। ইহাকে 'রুটী-ফল' বলিয়া তর্জ্জমা করা অপেক্ষা বিলাতি কাঁটাল বলিলেও বলা যায়। ব্রেড-ফ্রুট কথাটী যদি সাধারণ লোকের জিহ্বায় আটক খায় তাহাতে ক্ষতি কি? আট্‌কাইলে শব্দটী না হয় 'টোমাটো' স্থলে (Tomato) 'তেমতি' রূপে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইবে। তথাপি কিন্তু বিকৃত শব্দ হইতে আসল কথাটী চেষ্টা করিয়া উদ্ধার করিতে পারা যায়।

ব্রেড-ফ্রুট গাছের স্বাভাবিক জন্মস্থান ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্বউপদ্বীপ যবদ্বীপ ও মরীচসহর। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এক্ষণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু দুই এক স্থান ব্যতীত কুত্রাপি ফল হইতে দেখা বা শুনা যায় নাই। ইহার ফল কাঁটালের ন্যায় কিন্তু খাইতে কিরূপ, গ্রন্থকারের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তবে শুনা

খায় এই ফল, অগ্নীতে দগ্ধ করিয়া শাঁস খাইতে রুটীর ন্যায়। কলিকাতার ম্যাঙ্গো লেনে (Mango lane) একটী বড় গাছ আছে এবং সেই খানেই গ্রন্থকার ইহার ফল দেখিয়াছেন। আজকালের নূতন বাগানে কেহ কেহ ব্রেড-ফ্রুট গাছ পুতিয়াছেন।

বীজে চারা জন্মে। গাছ বেলে মাটিতে ভাল তেজ করে না। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক চাপা, এরূপ স্থানে গাছ ভাল থাকে। গাছের পত্র সকল প্রায় একহাত লম্বা এবং দৈর্ঘ্যে আধ হাত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ফল বাছাই, বোঝাই ও চালান।

ব্যবসায়ের জন্যই হউক বা সখের জন্যই হউক, ফল বাছাই, বোঝাই ও রক্ষণ করিবার প্রণালী জানিয়া রাখা সকল উদ্যান-স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বা অবহেলাবশতঃ অনেক সময়ে বিস্তর ফল নষ্ট হইয়া থাকে। ফল চালানের বিষয় ব্যবসায়ীর বিশেষ জ্ঞাতব্য,—সৌখীনগণেরও তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, কেননা তাঁহাদিগকেও অনেক সময়ে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে ফল প্রেরণ করিতে হয়।

ছোট বড়, ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সকল ফল একত্রে থাকিলে ভাল জিনিসের আদর হয় না,—ক্রেতাগণের নিকটেও তাহার যথোপযুক্ত মূল্য হয় না। এজন্য আকার ও গুণানুসারে সংগৃহিত ফলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, দাগী, পচা, রসা ও অতিরিক্ত পাকা ফলগুলিকে সতন্ত্র করিতে হইবে। এই সকল দাগী, পচা প্রভৃতি ফলের সঙ্গে ভাল ফল থাকিলে শেষোক্ত ফলও নষ্ট হইয়া যায়।

সংগৃহিত হইবার অব্যবহিত পরেই ফল বাছাই না করিয়া দুই চারি ঘণ্টাকাল কোন শুষ্ক স্থানে, বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া তৎপরে বাছাই করিলে ভাল হয়। তবে পচা, দাগীগুলিকে

দেখিবামাত্রেই সতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনেক ফলে সেই রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে। ফলগুলিকে এইরূপে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সময়ের মধ্যে ফলের বোঁটার রস বা আটা শুষ্ক হইয়া যায়। ফলের গাত্রময় আটা লাগিয়া গেলে কেবল যে তাহাতে আটার দাগ হয় তাহা নহে, ইহাতে ফল খারাপও হইয়া থাকে।

বোঁটা হইতে আটা নির্গমণ রোধ হইলে, ফলের স্বভাব বা অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিতে অথবা ভিজা কাপড় বা স্পঞ্জ (Sponge) দ্বারা ফলগুলিকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে জলে ধৌত করিলে বা ভিজা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিলে একদিকে ফলগুলি দেখিতে যেমন পরিষ্কার হয়, অন্যদিকে শীঘ্র নষ্ট হইতেও পারে না। এক্ষণে পরিষ্কৃত ফলগুলিকে বায়ু সঞ্চালিত কোন শুষ্ক স্থানে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। ভিজা অবস্থায় স্তূপীকৃত করিলে ফল উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। উত্তপ্ত ফল শীঘ্রই পচিয়া যায়।

এস্থলে জানিয়া রাখা উচিত যে, ফলের সহিত গাছের শাখা বা বোঁটা সংযুক্ত না থাকে। পত্র, পুষ্প, শাখা বা বোঁটা আদৌ ফলের সহিত সংলগ্ন না থাকিলে, ফলমধ্যস্থিত শাঁস অপেক্ষাকৃত অধিক দিন সরস থাকে।

ফলের আকার ও স্বভাবানুসারে উহাদিগকে বোঝাই

বা প্যাক করিবার জন্য সতন্ত্র পাত্র ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ আম্র, লিচু, জাম, সপেটা প্রভৃতিকে বিদেশে পাঠাইবার জন্য ঝুড়ি ব্যবহৃত হয়। এই ঝুড়ির মধ্যে শেওড়া, লিচু, বা ঐরূপ কোন শক্ত পাতা বিস্তৃত করিয়া দেওয়া পদ্ধতি আছে। আর আঙ্গুর প্রভৃতি কোমল জাতীয় ফলকে প্যাক করিতে হইলে দেবদারু বা পাইন (Pine Wood) কাষ্ঠের চ্যাপ্টা গোলাকার হাল্‌কা বাক্সের মধ্যে স্তবকে স্তবকে তুলা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ফলগুলি সাজাইয়া দিতে হয়। এতদুভয়বিধ প্যাক করিবার প্রণালীতে কথঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। ঝুড়ির মধ্যে প্যাক করিবার সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, নাড়াচাড়া পাইলে ফলগুলি নড়িয়া যায় এবং এইরূপে নাড়াচাড়া পাইলে পরস্পরের ঘর্ষণে অথবা ঝুড়ির গাত্রের আঘাতে ফলগুলি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দাগী হয় অথবা বিস্বাদ হইয়া যায়। এজন্য বিনা আঘাতে এবং নিরাপদে ফলগুলিকে বিদেশে পৌঁছাইতে হইলে, প্রথমতঃ ছিদ্র হীন একটী টিনের বাক্স মধ্যে কাগজ বিছাইতে হইবে। প্যাক করিবার জন্য সতন্ত্র কাগজ বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সম্ভব হইলে সেই কাগজ নতুবা খবরের কাগজ বাক্সের তলায় পাতিয়া ও পার্শ্বদেশে বিস্তৃত করিয়া, তদুপরে শুষ্ক ঘাস অথবা দেবদারু বা পাইন কাষ্ঠের গুঁড়া বা চাঁচ্‌নি বিস্তৃত করিয়া, ফলগুলিকে এক একটী করিয়া তাহার উপরে সাজাইয়া, পুনরায় ঐরূপ উপকরণ দ্বারা ফলগুলিকে ঢাকিতে হইবে। যতক্ষণ বাক্সটী

পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ এইরূপে স্তবকে স্তবকে ফল সাজাইতে হইবে। অবশেষে বাক্স পুরিয়া গেলে সর্ব্বোপরি ফলের স্তবকে দুই তিন পুরু কাগজ বিছাইয়া পার্শ্বস্থিত কাগজগুলিকেও টানিয়া একত্রিত করতঃ তাহার উপরে পুনরায় কাঠের গুঁড়া চাচ্‌নী বা ঘাস দ্বারা উত্তমরূপে ঢাকিয়া এবং ধীরতার সহিত চাপিয়া বাক্সের ঢাক্‌নি বন্ধ করিতে হইবে। প্যাকিং কার্য্যে সাফল্য লাভের পক্ষে একটী গুহ্য নিয়ম এই যে, বাক্সের মধ্যে কোন রূপে বাতাস না প্রবেশ করিতে পারে অথবা ফলগুলি অতিশয় পাকা বা আদৌ ভিজা না হয় এবং প্যাকিং করিবার উপকরণ কোনরূপে ভিজা বা কাঁচা না হয়। যতই যত্ন করিয়া প্যাক করা যাউক, বাক্স মধ্যে সামান্য আর্দ্রতা থাকিলে নিশ্চয়ই ফল নষ্ট হইবে। টিনের বাক্স মধ্যে এইরূপে ফল বোঝাই করিলেই যে তাহা বিদেশে প্রেরণোপযোগী হইল তাহা নহে। এক্ষণে সেই টিনের বাক্সটী একটী দেবদারু বা পাইন কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সে উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। দেবদারু বা পাইন কাষ্ঠের যে উল্লেখ করা গেল, তাহার কারণ এই যে, এতদুভয় কাষ্ঠই বড় হাল্‌কা অথচ মজবুদ। এইজন্য রপ্তানি কার্য্যে ইহা বিশেষ উপযোগী। কাষ্ঠ ভারি হইলে বহনীতে অনেক মজুরি পড়ে এবং মাশুলও অধিক লাগে।

কমলালেবু, ভাল আম্র, পেয়ারা প্রভৃতি কোমল ফলগুলিকে যদি একটী একটী স্বতন্ত্ররূপে কাগজে মুড়িয়া উল্লিখিত মতে প্যাক করা যায় তাহা হইলে আরও ভাল হয়। পাকা

আম্র, আঙ্গুর প্রভৃতির জন্ত ঘাস, কাষ্ঠের গুঁড়া রা চাচ্‌নীর পরিবর্ত্তে তুলা ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

কলা প্রেরণ পক্ষে কাঁদি অপেক্ষা ছড়াই সহজ। গাছ হইতে কাঁদি কাটিয়া আনিয়া ছড়াগুলিকে সতন্ত্র করতঃ উহার আটা শুষ্ক করিয়া যথা নিয়মে বাক্স মধ্যে সাজাইতে হইবে।

নারিকেল রপ্তানি করিতে হইলে অনেকে উহার খোসা খুলিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে ফল হাল্‌কা হয় এবং বহনী খরচা কম পড়ে সত্য, কিন্তু এ অবস্থায় অধিক দিবস থাকিলে নারিকেলের জল কমিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে শস্যেরও স্বাদে বৈলক্ষণ্য ঘটে। এজন্ত অধিক দিবস রাখিতে হইলে খোসা সমেত রাখা উচিত। নারিকেল চালান করিতে উল্লিখিত প্রণালীতে বোঝাই করিবার আবশ্যক নাই। সামান্ত ঝুড়িতেই বোঝাই করিয়া পাঠান চলিতে পারে।

ফল প্যাক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা গেল, অনেকে হয়ত তাহা আড়ম্বর মনে করিতে পারেন, কিন্তু যিনি পয়সা খরচে পরাঙ্মুখ নহেন কিম্বা যিনি ব্যবসায়ী তাঁহার পক্ষে ইহা অন্ততঃ পরীক্ষা করা উচিত। স্বীকার করি ইহাতে খরচা আছে, কিন্তু বাজারে যদি নির্দ্দোষ ও অক্ষত ফলটী আমদানী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি দাগী, পচা ও নিকৃষ্ট ফলের অপেক্ষা ইহাতে অধিক মূল্য আদায় হয় না? আর তাহাতে কি এই সমুদায় খরচ পোষাইয়া লাভ হয় না?

ফলের গুদাম।

যাঁহাদিগের ফলের বিস্তৃত কারবার আছে, তাঁহাদিগের সুশৃঙ্খলনির্ম্মিত একটী গুদাম থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেননা এককালে বিস্তর ফল পাকিয়া উঠিলে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে রাখিতে না পারিলে হয় ফল নষ্ট হইয়া যাইবে, না হয় দরের ইতর বিশেষ করিবার অবসর না পাইয়া বা বাজার দর উঠিবার কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, পাইকার বা ব্যাপারিদিগকে যে সে দরে মাল ধরিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যাঁহাদিগের গুদাম আছে, তাঁহাদিগকে এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না এবং দায়গ্রস্থ হইয়া জিনিষ বিক্রয় করিতে হয় না। গাছে যেমন ক্রমে ক্রমে ফল পাকিতে থাকিবে, তেমনই ক্রমে ক্রমে উহা সংগ্রহ করিয়া গুদামে রক্ষা করিতে হইবে এবং উচিত মূল্য পাইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। একদিকে অধিক লাভের আশায় যেমন ফলকে ঘরে আট্‌কাইয়া রাখা উচিত নহে, অন্যদিকে তেমনই অতিরিক্ত পাকা ফলকেও যত শীঘ্র পারা যায়, বিদায় করিতে পারিলেই লাভ।

গুদাম ঘরটী বিশেষ আড়ম্বরবিশিষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে গুদামের যেগুলি প্রয়োজন তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। গুদাম ঘরটী সাধারণ জমী হইতে অন্ততঃ দুই তিন ফুট উচ্চ মেজেবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং গৃহমধ্যে আলোক ও উত্তাপ প্রবেশের নিমিত্ত আবশ্যক মত জানালা

দরজা থাকা চাই। মেজে উচ্চ হইলেও যদি যে ঘরে যথেষ্ট আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে, তবে তাহা অতিশয় স্যাঁতসেঁতে হইয়া থাকে। এপ্রকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে ফল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। আর একটী কথা এই যে, সন্থ মেজের উপরে কোন ফল রাখিবে না, কারণ ইহাতেও ফলে সর্দ্দি লাগে; এজন্য গৃহমধ্যে তক্তাপোষের উপরে অথবা বাঁশের মাঁচা করিয়া তাহাতে ফল সাজাইয়া রাখাই প্রশস্ত।

ফলকে সর্ব্বদা নাড়াচারা বা টিপাটিপি করা উচিত নহে। যত কম নাড়াচাড়া করিয়া কার্য্যোদ্ধার হয় ততই ভাল, কারণ অধিক নাড়াচাড়ায় ফলের স্বাদ খারাপ হইয়া যায়।

ফলের ব্যবসায়।

ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে ফলের ব্যবসায় করিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না এজন্য বাজারে ভাল ফল কম আমদানী হয় এবং যাহা হয় তাহাও মহার্ঘ। যাঁহাদিগের ফলের বাগান আছে তাঁহারা হয় বাগান জমা দেন, না হয় ফসলের সময় ব্যাপারী-দিগকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ফল বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাতে দুইটী অনিষ্ট হয়, এবং তাহাও উদ্যানস্বামীর। ইহাতে প্রথমতঃ ফলগের যথেষ্ট মূল্য পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ বাগানের উপযুক্ত তদ্বির হয় না। যাহারা বাগান জমা লয় বা ফসলের সময় ফসল খরিদ করে, তাহারা জমার পাট বা

গাছের তদ্বির কখনই করে না, কারণ জমীর উপর তাহাদিগের কোন সত্ব নাই এবং যাহার বা থাকে, তাহাও অল্প মেয়াদী। এ অবস্থায় কেহ জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রম বা অর্থব্যয় করিবে না ইহা নিশ্চত। ধান্য, গোধুম প্রভৃতি শস্য বা শাক-সবজীর জন্য যাহারা জমী খাজানা করিয়া লয়, তাহারা অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত খরচা উঠাইয়া লইয়া লাভ করে, কিন্তু ফলের বাগানে অপেক্ষাকৃত অধিক খরচ এবং ফল লাভে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। এই সকল কারণে যাহারা বাগান জমা লয় তাহারা অপরের জমীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায় না।

ফলের বাগান জমা লইতে হইলে অন্ততঃ পনর বৎসরের কম মেয়াদে লওয়া উচিত নহে। আবার যাঁহারা ফলের বাগান জন্য খাশি জমি লইতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মৌরসী বা লাখেরাজ জমী লওয়াই সঙ্গত। জমীর উপরে স্থায়ী সত্ব না থাকিলে ফলকর ব্যবসায়ে লাভ হয় না। ফলের ব্যবসা সম্বন্ধে এই একটি প্রধান অন্তরায়। এতদ্ব্যতীত ফলের আবাদে লাভ করিতে অনেক বিলম্ব হয়, এজন্যও এত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অনেকে তাহার অনুসরণ করিতেপারেন না। পরিশ্রম ও অর্থের আশু লাভ না দেখিতে পাইলে উৎসাহ ভঙ্গ ও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় স্বীকার করি, কিন্তু ভাবী ফলব্যবসায়ীদিগের প্রতি আমাদিগের পরামর্শ এই যে, আশু লাভজনক আবাদের সঙ্গে ফলকর বাগানের আয়োজন করিলে অনেক শ্রম ও অর্থব্যয়ের লাঘব হইতে পারে।

সমুদ্রপারের কথা ছাড়িয়া দিই। ভারতের নানাস্থানে

এক্ষণে কয়েক ঘণ্টার পথ হইয়াছে, অথচ এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের ফল ব্যবহার করিতে পায় না। ইহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয়। অধিক দূরের কথা নহে, বাঁকুড়া, বীরভূম অতিক্রম করিলে ভাল নারিকেল পাওয়া যায় না, মুরসিদাবাদে আনারস পাওয়া যায় না ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষিত লোকে এ সকল ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকল ফলই এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে পারে এবং তাঁহারাও তাহাতে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে পারেন। ইহা প্রত্যক্ষ যে, যে দেশে যে ফল জন্মে, তথায় তাহার অনেক অপচয় হইয়া থাকে, কিন্তু ফলের রীতিমত ব্যবসা চলিত থাকিলে উদ্বৃত্ত ফলে বিস্তর অর্থাগম হয় কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি অতি অল্প লোকের।

---

and are and one written so ably, as this book has been cannot fail to command the appreciation of those for whom it is intended."

Amrita Bazar Patrika, January 7, 1895.

"The object of this publication is to help the middle classes in the pursuit of agriculture, which in these days of dearth of employment is recommended as the only means by which they can earn a decent livelihood. The book is divided into two parts, the first treating of the preliminaries, such as choice of land, implements, manure, seedlings &c., and the second giving *Practical* Instructions in cultivating tobacco, wheat, pulses, condiments, and other necessary articles of domestic consumption or use. * * *. The writer's practical experience of the subject he deals with, and his knowledge of the European methods of agriculture combine to render his production one of unquestionable utility."

Indian Mirror, April, 4, 1895.

"We cannot but thank Babu Probodh Chundra De too much for the treatise he has just published on agriculture. * * *. The publication of the book by Babu probodh Chundra De, who has a thorough acquaintance with the subject both in its practical and theoritical aspects cannot therefore but be heartily welcomed. He has given a succinct account of the ways, means and prospects of a beginner in agriculture, so that he can safely venture upon it with the help of the treatise. We firmly believe that the book will command a ready sale and help to utilise the energy and time of our countrymen which are being wasted now in many fruitless and unhappy exertions."

Weekly News, February 1, 1895.

"The author has given in a condensed form many practical hints regarding the improvement of agriculture in Bengal. The book appears to be of sterling merit, and the young Bengal will find in it much to learn. It will also be a welcome companion to gentlemen interested in agriculture."

The Queen, January 7, 1895.

"The publication of this book as well as similar other books is significant

The book has been written for the benefit of these people. We personally know the young author, and we are glad to find his long experience in the line has enabled him to do justice to his undertaking. * * We are glad to find the book has become popular * * * We recommend the book for the perusal of all who have liesure or opportunity to take any interest in gardening or agriculture."

Unity and the Minister, March 3, 1895.

---

* * * কৃষিবলই বঙ্গের বল। বঙ্গ আমাদের চাষার দেশ। প্রবোধচন্দ্র এই কৃষির নানাবিধ সুপথ দেখাইয়া দিয়াছেন, কৃষি বিষয়ে নানারূপ প্রত্যক্ষ ফল উপদেশ করিয়াছেন; তিনি দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক সাধ্যমত উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন, অসাধ্য উপায়ে ইঙ্গিত করেন নাই; নিজে যে সকল পথে ফল পাইয়াছেন, পরকে সেই সকল পথেই যাইতে বলিয়াছেন,—পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। * * * প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থ খানি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সকলের পক্ষে সুপাঠ্য, অনেকেরই অবশ্য পাঠ্য। 'কৃষিক্ষেত্র' যে সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইবে, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, ২৯শে মাঘ সন ১৩০১ সাল।

"আমরা কৃষিক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সকলেই যে কৃষিকার্য্যে কিছু না কিছু লাভ করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে জমির সার কি করিয়া দিতে হয়, বীজ[illegible] করিতে হয়, কি করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে হয়

তাঁহার বর্ণনা আছে। লিখিবার প্রণালী যেমন সুন্দর, বুঝাইবার প্রণালীও ততোধিক। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বর্ত্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে যাঁহাদের অক্ষর পরিচয় মাত্র হইয়াছে, তাঁহারা এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া নিজের উপকার সাধিত করিবেনই পরন্তু গ্রন্থকারকেও উৎসাহ দিতে ত্রুটী করিবেন না। প্রবোধ বাবু কৃষি বিদ্যায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, লণ্ডন হইতে F. R. H. S. উপাধি পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার কৃষিক্ষেত্রের বহুল প্রশংসা করিতেছি। স্থান থাকিলে আমরা পুস্তকের দু চারিটী প্রবন্ধ তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম, সুবিধা হইলে তাহাও করিব। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার। মূল্য এক টাকা মাত্র।"

সুলভ-দৈনিক, ১৯শে ফাল্গুন, সন ১৩০১ সাল।

"প্রবোধ বাবু নিজে "হাতে-কলমে" অনেক রকম চাষের কাজ করিয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক। যাঁহারা কৃষি-বিদ্যার অনুশীলনে সচেষ্ট, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন। আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ সরল ভাষায় লিখিত।" জন্মভূমী, মাঘ, সন ১৩০১ সাল।

"রোগীকে শয়ন প্রিয়" না বলিয়া রোগ মুক্তির উপায় দেখাইয়া দেওয়াই প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্য। প্রবোধ বাবু "কৃষিক্ষেত্র" দ্বারা অন্নচিন্তাবিহ্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবিকা সমস্যার একটী সহজ মীমাংসা করিয়াছেন।"

নব্য ভারত, ফাল্গুন ও চৈত্র, সন ১৩০১ সাল।

---

* প্রবোধ বাবুর পুস্তকে কৃষি শিক্ষার উপযুক্ত অনেক কথা আছে। * পুস্তকখানিতে গ্রন্থকর্ত্তা অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সাধারণের উপকার হইবার সম্ভব এবং তাহা হইলে তিনিও যেমন আপনার শ্রম সফল বোধ করিবেন, আমরাও সেইরূপ উপকৃত হইব। * * * গ্রন্থকার নিজের বহুদর্শিতা বলে এবং স্বয়ং স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া যাহা আবশ্যক মনে করিয়াছেন, তাহাই পুস্তক খানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কৃষির উৎসাহী ব্যক্তিগণের ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবে এবং আমাদের আশা যে, সাধারণে পুস্তকখানির আদর করিবেন।" সুধাকর, ২রা চৈত্র, সন ১৩০২ সাল।

---

* * * আমাদের মনে হয়, দেশের প্রকৃত হিতৈষী তিনি, যিনি এ বিষয়ে আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন। "কৃষিক্ষেত্র" রচনা করিয়া প্রবোধচন্দ্র দে ইহাই করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস সিদ্ধ হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। প্রবোধ বাবু তাঁহার পুস্তকে কৃষিকার্য্যের উপযোগীতা বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন, ইহার উপায় অবলম্বনও যথেষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নানা প্রকার চাষ আবাদের প্রণালী দেখাইয়াছেন। পুস্তক খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পুস্তক খানি রচনা করিয়া বাস্তবিকই প্রবোধ বাবু সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

সঞ্জীবনী, ১লা বৈশাখ, সন ১৩০২ সাল।

"কৃষিক্ষেত্র" অর্থাৎ চাষকার্য্যের অনেক সার কথা সরল ভাষায় এ পুস্তকে উল্লিখিত আছে। চাষের নানা কথা যাঁহারা জানিতে চান, এ পুস্তক তাঁহাদের একবার দেখা ভাল"।

বঙ্গবাসী।

* * "প্রবোধবাবু কেবল পড়া চাষা নহেন, তিনি নিজে ও স্বহস্তে চাষবাস করিয়া যেরূপ ফললাভ করিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহা ছাড়া অন্য কিছু লিখেন নাই। এ পুস্তক বড় আদরের জিনিষ। * * তাঁহার পুস্তকে অনেক শিখিবার আছে। যাঁহারা নূতন চাষা হইতে চাহেন অথবা যাঁহারা চাষবাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উভয় পক্ষেই এ পুস্তক কাজে লাগিবে।" চিকিৎসক ও সমালোচক, এপ্রিল ১৮৯৫।

"আমরা পুস্তক খানি সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিয়াছি। পুস্তক খানি পাঠ করিলে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, পুস্তকের প্রণেতা একজন কৃষি বিষয়ে বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক। পুস্তকে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা কল্পনার জিনিষ বা পুস্তকগত বিদ্যা নহে। কৃষিবিষয়ে কার্য্যতঃ তিনি যাহা নিজ হস্তে করিয়াছেন বা কৃষিবিষয়ে তিনি যাহা স্বচক্ষে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারই অধিকাংশ বিষয় প্রবোধ বাবু অতি সরল ভাষায় এই পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়াছেন। পুস্তক-খানির প্রথম খণ্ড পাঠে কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও কৃষিবিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। মৃত্তিকা পরীক্ষা এবং বহুবিধ সারবিষয়ে এই খণ্ডে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই প্রশংসার জিনিষ। দ্বিতীয় খণ্ডে বহুবিধ লাভপ্রদ ভাদুই ও রবি ফসলের সুচারুরূপে

উৎপন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ নিচয় সন্নিবেশিত হওয়াতেই পুস্তক খানি বড়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। * * * আমরা এ প্রকার সারগর্ভ কৃষিবিষয়ক পুস্তকের সমাদর দেখিলে বড়ই আনন্দিত হইব। * * * কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'কৃষিক্ষেত্রের' ন্যায় পুস্তক সকলেরই একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। * * * এ প্রকার বহুমূল্য এবং প্রকৃত দেশ হিতকর পুস্তক কয়খানি পাওয়া যায়? 'কৃষিক্ষেত্র' খানি কৃষি-বিষয়ে উন্নতি সাধন করিবার পক্ষে যে প্রকার উপযোগী হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে। পুস্তক খানির কাগজ ও ছাপাই ভাল। আমাদের 'কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু' পত্রিকার গ্রাহকগণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রবোধবাবুর 'কৃষিক্ষেত্র' খানি পাঠ করিবেন, আমাদিগের ইহাই একান্ত প্রার্থনা।"।

কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু, জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩০২ সাল।

"প্রবোধবাবু শিক্ষিত যুবা পুরুষ; তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অবধি কৃষিকার্য্যেই জীবন যাপন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বহুদর্শিতা অন্যান্য লোক হইতে মূল্যবান এবং প্রকৃত পরীক্ষাসিদ্ধ। আমরা যত্নপূর্ব্বক প্রবোধ বাবুর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছি এবং তুলনা করিয়া দেখিয়াছি, কৃষি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ বহুদর্শিতা। কৃষিক্ষেত্রে মূলধন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষেত্র বিচার, সার, কৃষিযন্ত্র, বীজরক্ষা, বপন ও রোপণাদির প্রণালী এবং বঙ্গের নিত্য প্রয়োজনীয় শস্য সকলের আবাদ প্রণালী অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।"

বঙ্গনিবাসী, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রবোধবাবুর পুস্তকগুলি যে সাধারণের নিকট আদরণীয় হইয়াছে সে বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই তাহার কারণ, তৎপ্রণীত 'কৃষিক্ষেত্র' যাঁহারা খরিদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই 'সব্জীবাগ' লইয়াছেন। পুস্তকের গুণবত্তা ও সারবত্তা সম্বন্ধে ইহা একটী বিশেষ প্রমাণ। সাধারণের অবগতির জন্য দুই একখানি পত্র আমরা নিম্নে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"আমরা শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে কৃত 'কৃষিক্ষেত্র' ক্রয় করিয়াছি, কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ গুলি পাঠে অনেক বিষয় শিক্ষা পাইয়াছি। এখন তৎকৃত 'সব্জীবাগ' ক্রয়ের আবশ্যক বোধ হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক-খানা 'সব্জীবাগ' ভিঃ পিঃ'তে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।"

বশম্বদ শ্রীমনসিংহ সাংমা, কামরূপ।"

"শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দের 'কৃষিক্ষেত্র' ও 'সব্জীবাগ' পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ইহা বাস্তবিক অতি সুন্দর বই হইয়াছে।"—আপনার বশম্বদ শ্রীলালা নীলাম্বর রায়, কটক।

সব্জীবাগ।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগাম, গাজর, বীট, লিক্, লেটুস্, পেয়াজ, টোমাটো প্রভৃতি নানাবিধ বিলাতি এবং লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা, ফুটি তরমুজ ইত্যাদি নানাবিধ দেশী

শাক-সব্জীর কিরূপে সহজ ও প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিয়া সাফল্য লাভ করা যায়, এই সকল কথা এই পুস্তকে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

'সব্জীবাগ' সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মতামত।

* * The author Babu Probodh Chundra De, F. R. H. S. (London), is a welknown expert in agriculture and horticulture. Only a few months ago his first production KRISHI KSHETRA was published and it has since been highly appreciated by the press and the public. His second work SUBJIBAGH is as useful as the other. The peculiar feature of the book is the practical hints which may be easily followed even by a notice. Such works are expected to do immense good to our country. The book is neatly printed and very moderately priced.

Amrita Bazar Patrika September 18, 1895.

Two or three months ago, we had much pleasure in noticing a book KRISHI KSHETRA by Babu Probodh Chundra De, F. R. H. S. (London). We did not expect that the author will be able to give us another of his most valuable works. We can not therefore sufficiently thank Mr. Probodh Chundra De for his effort to spread agricultural knowledge amongst his countrymen. He is doing a thing for which his name will be gratefully remembered by all his countrymen.

As for his present work Sabjibagh,—a treatise on vegetable gardening—we need say very little. * * it is therefore, needless to say that his SABJIBAGH has been written in the style in which a great agricultural expert like him is expected to write. It is as good, if not letter, as his previous work. We have not the best doubt the book will be a great help to all house-holders who take any interest in vegetable gardening. We do not make any apology to recommend this book to our readers.

The Queen, June 17, 1895.

"কৃষিকার্য্যে প্রবোধ বাবুর বিশেষ অভিজ্ঞা আছে। তাঁহার 'কৃষিক্ষেত্র' সমালোচনার সময় আমরা এ কথা বলিয়াছি। সব্‌জীবাগে চাষবাসের অনেক কথা আছে। যাঁহারা কৃষি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চান, তাঁহারা প্রবোধ বাবুর এই "সব্‌জীবাগ" পাঠ করুন। আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে।"

জন্মভূমি, অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল।

"সব্‌জীবাগে বারমেসে তরি তরকারি ফল পাকুড় কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, কি করিয়া সব্‌জীর জমীর উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, প্রবোধ বাবু এই পুস্তকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। প্রবোধ বাবু এঢ়র্দ্দিনে এরূপ পুস্তক প্রচার করিয়া যে দেশের প্রভূত কল্যান সাধন করিতেছেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। * * * গৃহস্থ মাত্রেরই এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করা উচিত। আর ৮।১০ টাকার জন্য যার তার পদাঘাত সহ্য না করিয়া ইতরের অনুবৃত্তি না করিয়া দুই বিঘা দশ বিঘা জমীতে শাক সঁব্‌জী তৈয়ার করিয়া কোন গতিকে দিন কাটাইতে পারিলে এ মহা দাসত্বের অপেক্ষা তাহা যে শ্লাঘ্যতর সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবোধ বাবুর 'সব্‌জীবাগ' সে বিষয়ে প্রভূত উপকার করিবে। * * ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার।"

সুলভ-দৈনিক, ৩১শে অগেষ্ট ১৮৯৫ সাল।

"সব্জীবাগে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত শাক সব্জী, তরি তরকারির রোপণ প্রণালী বেশ শ্রেণীবদ্ধরূপে সুপ্রণালী সঙ্গতভাবে লিখিত হইয়াছে। পরন্তু প্রবোধ বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা প্রবোধ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন সম্পূর্ণ কৃষিকার্য্য না হউক বাড়ীর উঠানের পাশে ছোট খাট একটী সবজীবাগ প্রস্তুত করিতেও সকলকে অনুরোধ করি। এ কথায় কেহ কর্ণপাত করিবেন কি?" বঙ্গনিবাসী, ১৮ই অক্টোবর ১৮৯৫ সাল।

---

* * * "সব্জীবাগে শাক সব্জীর চাষবাসের কথা লিখিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক কেবল যে চাষিদের আবশ্যক তাহা নহে, গৃহস্থেরও ইহাতে অনেক কাজ দর্শিবে। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

চিকিৎসক ও সমালোচক, জুলাই, ১৮৯৫ সাল।

"প্রবোধচন্দ্র সত্য সত্যই হাতে কোদালে কৃষির কাজ করিয়াছেন; কিন্তু লেখা পড়াও তিনি জানেন। তাই এখন কোদালের বিদ্যা কলমে দেখাইতেছেন। 'কৃষিক্ষেত্রে' নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; 'সব্জীবাগেও' বিখ্যাত হইবেন। দেশী বিলাতি নানাবিধ শাক সব্জী কন্দমূল প্রভৃতি কিরূপে উৎপন্ন করিতে হয়, সুফলনের জন্য জমীর কিরূপ পাট করিতে হয়, রোপণাদিতে কিরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিতে হয়, কিরূপে ক্ষেত্রের উৎকর্ষ রাখিতে হয়, কিরূপে উৎপাদ্যের উন্নতি করিতে হয় ইত্যাদি সমস্ত কথাই "সব্জীবাগে" কথিত হইয়াছে, সকল

পথই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক কথায় নবজীবাগ" সুন্দর হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্র সমস্ত কাজই নিজে করিয়াছেন। * * * সুতরাং গ্রন্থ ভালই হইয়াছে।"

দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা, ১১ই আষাঢ় সন ১৩০২ সাল।

আমার ঠিকানায় পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পোষ্টে পুস্তক পাঠাইয়া দিব। অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দে।

২৭ নং দর্জীপাড়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।